বিভিন্ন স্থানে সাহাবীদের হাদীস শিক্ষাদান কার্য

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীদের এক জামাত হাদীস শিক্ষাদান কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সমগ্র আরব ভূমিকে হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করেন।

মদীনায় ঃ হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখের দরস চলতে থাকে। **মক্কায়ঃ** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীস শিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করেন। **কুফায়ঃ** হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। **বসরায়ঃ** হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) শাসনকার্য পরিচালনার সাথে সাথে হাদীসের দরসও অব্যাহত রাখেন। তাঁর সাথে সহযোগী হিসাবে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনও ছিলেন। **মিসরে ঃ** হযরত আমর ইবনুল আ'স ও আসলাম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। **সিরিয়ায়ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) এ কাজ আঞ্জাম দেন। **ইয়েমেনে ঃ** হযরত মু'আজ ইবনে জবল (রাঃ) হাদীস চর্চা করেন। **হিম্‌স শহরে ঃ** হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) হাদীসের দরস দেন। হযরত আবু মূসা আশআরী বসরায় পৌঁছার পর বলেছিলেন 'আমাকে হযরত ওমর (রাঃ) তোমাদের প্রতি পাঠিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও হাদীসে রাসূলের শিক্ষা দিই। (দারমী)

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন

মদীনার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে সাধারণতঃ দিনের বেলায় শিক্ষাদান করা হত। সে কারণে অনেক শ্রমজীবি ও বিভিন্ন পেশা অবলম্বনকারী লোক তথায় শরীক হয়ে ও ইলম হাসিল করার সুযোগ পেতেন না। এ জন্যে তাঁরা নৈশ বিদ্যালয় ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে বাধ্য হন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বলেন, 'রাতের অন্ধকারে যখন তাদেরকে ডাকা হত' তখন তাঁরা মদীনায় অবস্থিত তাদের শিক্ষাকেন্দ্রের দিকে চলে যেতেন এবং সেখানে তাঁরা সকাল বেলা পর্যন্ত পড়া শোনার কাজে মশগুল থাকতেন। (আল-ইমাম)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীদের শ্রেণীভাগ

যদিও সাহাবায়ে কিরামের প্রায়ই হাদীস শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তবে এ ব্যাপারে সকল সাহাবীর সমান সুযোগ ছিল না। যারা এক

হাজার বা ততোধিক হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাদের 'মুকসিরীন ফিল হাদীস' বলা হয়। যাঁরা পাঁচ শত থেকে হাজারের কম হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদের বলা হয় 'মুতাওয়াস্‌সিতীন'। আর যাঁরা চল্লিশ থেকে চার শত পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে 'মুকিল্লীন' বলা হয়। তার চেয়েও কম হাদীস বর্ণনাকারীদের 'আকল্লীম' বলা হয়।

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

সাহাবীদের মধ্যে যারা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন মোট সাত জন।

(১) হযরত আবু হুরায়রা (ইনতিকাল ঃ ৫৯ হিজরী) থেকে ৫৩৭৪ হাদীস। (২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (ইনতিকাল ঃ ৭৩ হিজরী) থেকে ২৬৩০ হাদীস। (৩) হযরত আনাস ইবনে মালিক (ইনতিকাল ঃ ৯৩ হিজরী) থেকে ২২৮৬ হাদীস। (৪) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ইনতিকাল ঃ ৫৭ হিজরী) থেকে ২২১০ হাদীস। (৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ইনতিকাল ঃ ৬৮ হিজরী) থেকে ১৬৬০ হাদীস। (৬) হযরত জাবীর ইবনে আব্বাস (ইনতিকাল ঃ ৭৮ হিজরী) থেকে ১৫৪০ হাদীস (৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (ইনতিকাল ঃ ৭৪ হিজরী) থেকে ১১৭০ হাদীস।

হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (ইনতিকাল ঃ ৬৭ হিজরী) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা সাত বা আট হাজার। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর উক্তি দ্বারা তা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন–'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত রাসূল (সাঃ) কোন সাহাবীই আমার অপেক্ষা অধিক হাদীস অবগত নন। কেননা তিনি লিখতেন আমি লিখতাম না। (বুখারী শরীফ)

দশম অধ্যায়

মহিলাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নানান ঘটনা

প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মধ্যে দ্বীনের আগ্রহ এবং নেক আমলের জয্বা পয়দা হয় তাহলে তাঁর সন্তান সন্তুতির উপরও এ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে তা নিঃসন্দে বলা যায়। বর্তমানে যুগে ছেলে-মেয়েদেরকে প্রথম হতেই এমন পরিবেশে রাখা হয় যার, দরুন শুরু থেকেই তাদের মধ্যে দ্বীনের বিরূপ মনোভাব না হলেও কমপক্ষে অবহেলা তো নিশ্চয়ই সৃষ্টি হয়। তাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য পিতা-মাতাই অধিকাংশে দায়ী বললে ভুল হবে না। প্রাথমিক অবস্থায় যদি এরূপ পরিবেশে প্রতিপালিত হয় তবে তাদের ভবিষ্যত কিরূপ হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তাস্‌বীহে ফাতেমী

হযরত আলী (রাঃ) একদিন জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে স্নেহের কন্যা ফাতিমার জীবন বৃত্তান্ত বলবে, তিনি ফাতিমা (রাঃ) নিজে আটা পিষতেন, যার দরুন তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং নিজেই মশক ভরে পানি আনতেন, তাই তাঁর বুকে মশকের রশির দাগ সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। আবার নিজেই ঘর ঝাড় দিতেন, যে কারণে পরিধেয় কাপড় ময়লাযুক্ত থাকত। রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একবার কিছু গোলাম ও বাঁদী আসলে আমি ফাতিমা (রাঃ) কে বললামঃ তুমি গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে একজন খাদেম নিয়ে আস। তোমার কাজে কর্মে তাহলে কিছুটা সাহায্য হবে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) খিদমতে হাযির হলেনঃ তখন সেখানে অনেক লোকজন ছিল (তিনি অতিমাত্রায় লাজুক ছিলেন বিধায়) লোক সম্মুখে কিছু না বলেই ফিরে আসলেন।

দ্বিতীয় দিন স্বয়ং রাসূল (সাঃ) আমাদের ঘরে এসে ইরশাদ করলেন, ফাতিমা! তুমি গতকাল কি জন্য আমার কাছে এসেছিলে? তিনি লজ্জায় চুপ রইলে আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফাতিমার অবস্থা নিজ হাতে চাক্কী চালনার কারণে হাতে দাগ পড়ে গেছে। সে নিজেই মশক ভরে পানি আনে, যার দরুন বুকে রশির দাগ পড়ে গেছে। তদুরপরি ঘর দুয়ারে ঝাড় দেয়ার কারণ কাপড় চোপড় ময়লা থাকে। তাই গতকাল বলেছিলাম, আপনার

খিদমতে গিয়ে একজন খাদেম আনার জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ফাতিমা (রাঃ) বলেছিলেন, আব্বাজান; আমার আর আলীর জন্য মেষের চামড়ার একটি মাত্র বিছানা, আমরা রাত্রি বেলায় এটা বিছিয়ে শয়ন করি আর দিনের বেলায় এর মধ্যেই উট বকরীকে খাওয়াতে হয়। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ ফাতিমা! ধৈর্যধারণ কর। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর কাছে দশ বছর যাবত একটি মাত্র বিছানা ছিল। মূলতঃ তা হযরত মূসা (আঃ)-এর জুব্বা ছিল। রাত্রি বেলায় এর মধ্যেই শয়ন করতেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেন, ফাতিমা! আল্লাহ্‌কে ভয় করে, পরহেযগারী কর, তাঁর হুকুম আহকাম পালন কর, আর ঘরের কাজকর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতে থাক এবং রাত্রে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন ততবার সোব্হানাল্লাহ্ ৩৩ বার আল হামুদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে শয়ন করবে। মনে রাখবে, এরূপ করা খাদেম হতে অধিক উত্তম। হযরত ফাতিমা (রাঃ) আরয করলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর রাজী আছি। (আবু দাউদ)

হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর কথার অর্থ হল, আমার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা ব্যবস্থা করেছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট। এটাই ছিল শেষ নবী (সাঃ)-এর স্নেহের কন্যার সংসার জীবন। আর আজকাল আমরা একটু সচ্ছল হয়ে গেলেই সংসারের কাজ কর্ম তো দূরের কথা, ব্যক্তিগত কাজকর্মও আমাদের দ্বারা করা সম্ভব হয় না। উপরে বর্ণিত হাদীসে তিন তাসবীহের বর্ণনা শুধু শয়নের সময় এসেছে; কিন্তু অন্য হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো পড়ার নির্দেশ এসেছে, তবে সেখানে আল্লাহু আকবার ৩৩ বার আর শেষে একবার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা-লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল, হামদু ওয়া হওয়া আলা কুল্লি শাইরিন কাদীর" পড়ার হুকুম এসেছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) এর দানশীলতা

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে লক্ষাধিক দেরহাম স্বর্ণমুদ্রা আসলে তিনি তৎক্ষণাৎ দেরহামগুলো দান করতে লাগলেন এবং তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি একটি দেরহামও নিজের জন্য রাখলেন না। তিনি রোযাদার ছিলেন তাই সন্ধ্যার সময় বাঁদী ইফতারের একটি রুটি এবং কিছু যয়তুনের তেল পেশ করে আরয করল, একটা দেরহামের গোশ্‌ত খরিদ করে আনলে কতই না ভাল হত! তা দ্বারা ইফতার করতে পারতেন। তিনি বললেন, এখন আর অভিযোগ করে লাভ কি? তখন স্মরণ করিয়ে দিলেই তো হত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর জন্য এ ধরনের হাদীয়া হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ

ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) পাঠাতেন, কিন্তু তিনি সেগুলো অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। কত বড় দানশীলতা! এত বিরাট অংকের টাকা দান করে দিলেন অথচ ইফতারের জন্য একটি মাত্র দেরহাম রাখতেও ভুলে গেলেন। বর্তমান যুগে এসব ঘটনার সত্যতা সম্পর্কেও আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অবশ্য সাহাবীদের জীবনে এ ধরনের শত শত ঘটনাবলীর তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কেননা, এটাই ছিল এসব মহা মানবদের সাধারণ অভ্যাস।

আরেকটি ঘটনা একদিন তিনি রোযা ছিলেন। এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলে ঘরে একটি মাত্র রুটি ছিল। তিনি মহিলা খাদেমকে বললেন, ভিক্ষুককে তা দিয়ে দাও। সে বলল, উম্মুল মুমিনীন! ইফতারের জন্য ঘরে আর কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বললেন, তাতে কি? তুমি তাকে তা দিয়ে দাও। আরও একটি ঘটনা একবার তিনি একটা সাপ মেরেছিলেন। স্বপ্নযোগে দেখলেন, কেহ যেন বলছে, আপনি একজন মুসলমান হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, মুসলমান হলে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করত না। উত্তর এল, সে পর্দার সাথে এসেছিল। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে একজনের হত্যার জরিমানা স্বরূপ বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সদ্‌কা করে দিলেন। একদিন হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, খালা আম্মাকে আমি সত্তর হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সদ্‌কা করতে দেখেছি, অথচ তখনও তাঁর পরণে ছিল তালিযুক্ত কাপড়।

হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে সদ্‌কা থেকে বিরত রাখা

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ভাগ্নে। শৈশবে তিনিই আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-কে প্রতিপালন করেন। তাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুক্ত হস্তে সর্বস্ব দান করার উপর পেরেশান হয়ে বললেন, খালা আম্মা এভাবে দান খয়রাতের দরুন হযত কষ্ট পেতে পারেন। কাজেই যেকোন ভাবে দানের হাতকে বন্ধ করতে হবে। ঘটনাক্রমে এ উক্তি হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর কানে পৌছলে ইব্‌নে যোবায়ের তাঁর দানের হাত বন্ধ করতে চায় এ দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কসম খেয়ে বসলেন, বাকী জীবনে কখনও তার সাথে কথা বলবেন না। এ কসমের শুনে ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর মনে ভীষণ আঘাত লাগল। তিনি খালা আম্মার অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য বহু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের কসমের কথা উল্লেখ করে ক্ষমা করলেন না। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) যার পর নাই

পেরেশান হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নানার বংশের দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সুপারিশের জন্য সাথে নিয়ে খালার কাছে গেলেন। তাঁরা দু'জন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইবনে যোবায়েরও তাঁদের সাথে চুপে চুপে ঘরে ঢুকে গেলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) পর্দার ভিতর থেকে যখন এ দু'ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলেন, তখন হঠাৎ ইবনে যোবায়ের পর্দার ভিতর ঢুকে গেলেন এবং খালাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং খালাকে মানানোর জন্য খোশামোদ করতে লাগলেন। মুসলমানদের সাথে কথা বর্জন করা সম্পর্কিত রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস সমূহ শুনাতে লাগলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) বাণীসমূহ শুনে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে কথা শুরু করলেন। কিন্তু কসমের কাফ্‌ফারা তিনি আদায় করলেন। পরবর্তী জীবনে যখনই সে কসম ভঙ্গ করার কথা মনে হত এত বেশী ক্রন্দন করতেন যে, চোখের পানিতে উড়না ভিজে যেত। –(বুখারী)

এখনে চিন্তার বিষয় হল যে, আমরা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত কত শত কসম খেয়ে থাকি, কিন্তু যাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র নামের মর্যাদা ও তাঁর নাম নিয়ে কসম করার গুরুত্ব রয়েছে একমাত্র তাঁরাই অনুধাবন করতে পারেন ওয়াদা ভঙ্গ করলে অন্তরে কিরূপ আঘাত লাগে?

ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পরিণতি

আল্লাহ্ বলেছেনঃ "তোমরা ওয়াদা পালন কর। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" আল্লাহ্ যা কিছু আদেশ করেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তার সবই ওয়াদার অন্তর্ভূক্ত। কেননা এসব পালনে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদাবদ্ধ। আল্লাহ্ আরো বলেছেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা চুক্তি পালন কর।"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ চুক্তির অর্থ যা কিছু কুরআনে হালাল ও হারাম করা হয়েছে এবং যা কিছু নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হয়েছে। মুকাতিল বলেনঃ চুক্তি অর্থ কুরআনের মাধ্যমে বান্দার ওপর আরোপিত হালাল ও হারাম এবং বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র বিধান এবং মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পাদিত যাবতীয় চুক্তি, অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ চারটি দোষ যার মধ্যে থাকবে সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকরীর একটা উপাদান থাকবে যতক্ষণ সে তা বর্জন না করেঃ যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা

বলে, যখন তার কাছে কোন জিনিস আমানত, গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে সে তা ভংগ করে এবং যখন কারো সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়, তখন সে সীমা ছড়িয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেনঃ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি বাদী হবঃ যে ব্যক্তি ওয়াদা করে। যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রী করে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি কোন কর্মচারী নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না। (বুখারী)। রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে কোন অঙ্গীকার আবদ্ধ নয় সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করে। -(মুসলিম)

হযরত অয়িশা (রাঃ)-এর আল্লাহ্ভীতি

রাসূল (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে কতটুকু ভালবাসতেন তা কারো অজানা নেই। এমন কি কোন একজন সাহাবী রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি স্ত্রীগণের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন, আয়িশাকে। হযরত আয়িশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তদুপরি শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তিনি এত সুদক্ষ ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত মাসায়েল শিক্ষা করার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম করতেন। তিনি বেহেশতের মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী থাকবেন এ সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়েছে। মোনাফিকরা তাঁর উপর যে অপবাদ দিয়েছিল তা খন্ডন করে কুরআন মাজীদে তাঁর পবিত্রতার উপর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নিজে বলেন, দশটি বিশেষ কারণে আমি রাসূল (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মুক্ত হস্তে দান খয়রাতের বহু কাহিনী হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এতসব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আল্লাহ্র ভয়ে এত বেশী জড়সড় থাকতেন যে, অধিকাংশ সময় বলতেন, হায় আফসোস্! আমি যদি বৃক্ষ হতাম তবে সর্বদা আল্লাহ্র তাসবীহ পড়তে থাকতাম এবং পরকালে আমাকে হিসাব দিতে হত না। কখনও বলতেন, হায়! আমি যদি পাথর হতাম! কখনো কখনো বলতেন, হায়! আমি যাদি মাটির ঢিলা হতাম অথবা আমি যদি গাছের পাতা হতাম কিংবা কোন তৃণলতা হতাম। আল্লাহ্ভীতির এরূপ অপূর্ব নিদর্শন একমাত্র তাঁদের নসীবেই লেখা ছিল।

উম্মে সালমা (রাঃ)-এর জন্য স্বামীর দোয়া ও হিযরত

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীর হওয়ার পূর্বে আবু সালমা নামক সাহাবীর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী আবু সালমার সাথে তাঁর আফুরন্ত ভালবাসা ছিল। তার নিদর্শন একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, একবার উম্মে সালমা (রাঃ) আবু সালমা (রাঃ)-কে বললেন, আমি শুনেছি স্বামী স্ত্রী উভয়ে জান্নাতী হলে, স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করে থাকে, তাহলে সে নিজের স্বামীকে পাবে। তদ্রুপ স্বামী যদি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ না করে তাহলে, সেও নিজের স্ত্রীকে পাবে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আবু সালমা (রাঃ) কে এ কথা বলার পর বললেন, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমাদের যে কেহ আগে মৃতুবরণ করলে অপরজন আর দ্বিতীয় বিবাহ করব না। এর উত্তরে হযরত আবু সালমা (রাঃ) বললেন, তুমি কি আমার কথা শুনবে? তিনি বললেন, আমি তো আপনার কথা শুনার জন্যই পরামর্শ করছি। হযরত আবু সালমা (রাঃ) বললেন, আমি আগে মারা গেলে তুমি অন্য স্বামী গ্রহণ করে নিও। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমার পর উম্মে সালমাকে আমার চেয়ে উত্তম স্বামী দিও। যে স্বামী তাকে কোনরূপ কষ্ট দিবেনা।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। রাসূল (রাঃ) এর সাথে বিবাহের পূর্বে তিনি স্বামী আবু সালমার সাথে হিযরত কিভাবে করেন (উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন। আবু সালমা (রাঃ) যখন হিযরতের ইচ্ছা করেন, তখন আমাকেও একমাত্র ছেলে সালমাকে উটের উপর বসিয়ে তিনি নিজের উটের লাগাম ধরে টেনে চললেন। আমার আত্মীয় বণী মুগীরার লোকেরা তা দেখে আবু সালমাকে বলল, তুমি নিজের ব্যাপারে স্বাধীন; কিন্তু আমাদের মেয়েকে শহরে শহরে ঘুরানোর জন্য তোমার সাথে দিতে পারি না। এ কথা বলে তারা আবু সালমার হাত থেকে উটের রুজ্জু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য করল। এদিকে আমার শুশুরালয়ের বনী আবদুল আসাদের লোকজন এসে আমার বংশীয় আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল যে, তোমরা তোমাদের মেয়েকে রাখতে পার কিন্তু আমাদের বংশের ছেলে সালমাকে তোমাদের কাছে রাখব না। এ বলে তারা সালমাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিল। এরপর স্বামী একাই হিযরত করে মদীনায় চলে গেলেন।

এভাবে আমরা স্বামী-স্ত্রী পুত্র তিনজন তিন জায়গায় থেকে বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলতে লাগলাম। স্বামী মদীনায়, আমি পিত্রালয়ে আর ছেয়ে তার দাদার বাড়ীতে। আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি দুঃখে শোকে জর্জরিত হয়ে প্রত্যেহ ময়দানের দিকে বের হয়ে যেতাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে শুধু ক্রন্দন করতাম। এভাবে বিচ্ছেদের অনলে জ্বলে পুড়ে দীর্ঘ একটি বছর কেটে গেল। আমাকে এভাবে ক্রন্দনাবস্থায় দেখে আমার এক চাচাত ভাইয়ের মনে দয়ার উদ্রেক হল। সে আমার বংশের লোকদের কাছে বলল, এ বেচারীর জন্য কি তোমাদের একটুও দয়া হয় না?

সে আমাকে মদীনায় আমার স্বামীর কাছে পাঠানোর ব্যাপারে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলল, অবশেষে তারা এতে রাজী হয়ে আমাকে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে মদীনায় চলে যেতে পার। আমি মদীনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। এটা শুনে আমার শ্বশুরালয়ের লোকেরা আমার ছেলে সালমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

আমি একটি উট সংগ্রহ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে একাকী মদীনায় পথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করার পর তান্ঈম নামক স্থানে হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ) নামক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি বললেন, আপনি একাকী কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমার স্বামীর কাছে মদীনায় যাচ্ছি। তিনি বললেন আপনার সাথে আর কে আছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর কেহ নেই।

এ কথা শুনে তিনি আমার উটের লাগাম ধরে আগে আগে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ্র কসম! হযরত ওসমানের মত উত্তম লোক আমি আর কোন দিন দেখিনি। যখন আমি কোথাও অবতরণ করার ইচ্ছা করতাম তখন তিনি লাগাম ছেড়ে দূরে গিয়ে গাছের আড়ালে দাড়িয়ে থাকতেন। আবার যখন উটের উপর আরোহনের সময় হত তখন তিনি আসবাবপত্র সহ উটকে আমার কাছে বসিয়ে দিতেন। আমি সওয়ার হওয়ার পর পুনরায় উটের রুজ্জু ধরে তিনিও পথ চলা শুরু করতেন। এভাবেই আমরা মদীনায় পৌঁছে যাই। তখন পর্যন্ত আমার স্বামী আবু সালমা (রাঃ) কোবাতেই অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তাঁর সাতে আমাদের সাক্ষাত হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রাঃ) আমাকে স্বামীর কাছে পৌছিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। আল্লাহ্র কসম! তাঁর চেয়ে ভাল মানুষ আমি

কখনও দেখিনি। সে সময় স্বামী পুত্র হারিয়ে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি যতটুকু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি সেরূপ দুঃখ কষ্ট জীবনে কেহ পায়নি।

আল্লাহ্র উপর কতটুকু ভরসা থাকলে একাই হিযরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া যায়। বস্তুতঃ যাঁরাই আল্লাহ্র তায়ালার উপর ভরসা করে তাঁদেরকেই আল্লাহ্ এভাবেই সাহায্য করেন।

হযরত উম্মে যিয়াদ (রাঃ)-এর খায়রার যুদ্ধে অংশগ্রহণ

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে পুরুষগণ যেভাবে অদম্য আগ্রহের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তদ্রূপ নারীগণও যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। বরং সুযোগ পেলেই তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যেতেন। হযরত উম্মে যিয়াদ (রাঃ) বলেন, আমরা ছয়জন মহিলা খায়বারের যুদ্ধে শরীক হই। আমাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি জানতে পেরে রাসূল (সাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যখন খিদমতে হাযির হলাম তখন তিনি (সাঃ)-এর মোবারক চেহারায় কিছুটা ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পেলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা কার হুকুমে এখানে এসেছ এবং কার সাথে এসেছ? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি পশম বুনতে পারদর্শী যা যুদ্ধের সময় অপরিহার্য। তাছাড়া আহতদের জন্য জখমের ঔষধ আমাদের সাথে রয়েছে। আর কিছু করতে না পারলেও মুজাহিদীনদের জন্য তীর তো কুড়িয়ে দিতে পারব। কেহ অসুস্থ হলে তার সেবা করতে পারব। তাঁদেরকে ছাতুগুলে খাওয়াতে পারব। আমার এসব কথা শুনে রাসূল (রাঃ) আমাদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। –(আবু দাউদ)

সে যুগে মেয়েদের মধ্যে যেরূপ জিহাদী প্রেরণা ছিল আজকাল পুরুষদের মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হয় না।

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)-এর আকাংখা

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) এর খালা ছিলেন। রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় তাঁর ঘরে গিয়ে দুপুরে বেলায় আরাম করতেন। এক দিন রাসূল (সাঃ) আরাম করা অবস্থায় উম্মে হারাম (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি কেন হাসলেন? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা এখন আমাকে দেখালেন যে, আমার উম্মতের কিছু মুজাহিদ সামুদ্রিক অভিযানে এভাবে যাচ্ছে যে, যেমন সিংহাসনে উপবিষ্ট কোন বাদশাহ্। তখন হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)

আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দোয়া করুন আমিও যেন সে অভিযানে শরীক হতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি তাঁদের মধ্যেই থাকবে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) কিছুক্ষণ আরাম করার পর পুনরায় হেসে উঠলেন। হযরত উম্মে হারাম পুনরায় হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাঃ) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) আবার আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দোয়া করুন আমি যেন, তাদের দলভুক্ত হতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি প্রথম দলে শরীক হবে। রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফত যুগে সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস আক্রমণ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) অনুমতি দিলেন। তারপর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) একটি সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। সামুদ্রিক এ অভিযানে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) ও শরীক ছিলেন। এভাবে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়েছিল। এ অভিযান থেকে ফেরার পথে খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)-এর গাড় ভেঙ্গে যায় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। আর সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে একজন নারী হয়ে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য কি অদম্য স্পৃহাই না ছিল তাঁর।

স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন

হযরত আনাস (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে সালীম (রাঃ)-এর স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। সে ঘরে আবু ওমায়ের নামে একটি ছেলে জন্ম হয়। রাসূল (সাঃ) যখন তাঁদের ঘরে যেতেন তখন আবু ওমায়ের নিয়ে হাসি খুশী করতেন। হঠাৎ একদিন ছেলেটি মারা যায়। মৃত্যুর পর হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) গোসল করিয়ে চৌকির উপর শোয়ায়ে রাখেন এবং নিজে খুব সেজে গুজে খুশবু লাগিয়ে স্বামীর আসার অপেক্ষা করেন। হযরত আবু তাহলা (রাঃ) রাত্রি বেলায় ঘরে ফিরে যখন ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন উম্মে সালীম (রাঃ) বললেন, এখন একটু আরামে আছে, মনে হয় একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে। অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে শুয়ে পড়লেন এবং মিলনও হল। ভোরে হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) স্বামীকে বললেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। আর কথাটা হল এ যে কোন ব্যক্তি কারো কাছে কোন কিছু আমানত রাখে এবং পরে যদি তা ফেরত চায়, তবে তার

জিনিস তাকে ফেরত দেয়া উচিত কি না? স্বামী বললেন, নিশ্চয়ই ফেরত দেয়া উচিত। এরূপ জিনিস ফেরত না দেয়ার কি অধিকার আছে? এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) বললেন, তোমার ছেলে যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমানত স্বরূপ ছিল তা আল্লাহ্ তাআলা নিয়ে গেছেন। এভাবে ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে হযরত আবু তালহা (রাঃ) কিছুটা দুঃখিত হয়ে বললেন, তুমি প্রথমেই আমাকে বলনি কেন? তিনি সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন। রাসূল (সাঃ) এ মর্মান্তিক ঘটনা শুনে খুশী হয়ে দোয়া করে বলেন, হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা এ রাতে তোমাদের জন্য বরকত রেখেছেন। একজন আনসারী সাহাবী বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে সে রাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে তালাহা (রাঃ) মাতৃগর্ভে যান। পরবর্তীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে তালহা (রাঃ)-এর নয়টি ছেলে সন্তান হয়েছিল আর সবাই ছিলেন কুরআনের হাফিয।

কত বড় ধৈর্যের কথা। পুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করে স্বামীকে কষ্ট থেকে বাঁচালেন। কেননা খবর পেলে স্বামী না খেয়ে কষ্ট পেতেন।

উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর কুফুরের প্রতি ঘৃণা

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হওয়ার পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্নে জাহানের স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একত্রে মুসলমান হয়ে আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। সেখানে তাঁর স্বামী মুরতাদ হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কাফের অবস্থায় মারা যায়। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) সেখানে বিধবা অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

এ সংবাদ শুনে রাসূল (সাঃ) হাবশার বাদশাহার মারফত হযরত উম্মে হাবীবার সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি রাজী হয়ে যান এবং বাদশাহ নিজে এ বিবাহ পড়িয়ে দেন। বিয়ের পর তিনি মদীনায় চলে আসেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান হোদাবিয়ার সন্ধির পর এ সম্পর্কিত কিছু কথা বলার জন্য মদীনায় আসলে, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে সে বিছানায় বসতে চাইলে তিনি উক্ত বিছানায় পিতাকে বসতে দেননি। এতে আবু সুফিয়ান আশ্চর্য হয়ে বলে আমি কি এ বিছানার উপযুক্ত নই? উত্তরে তিনি পিতাকে বললেন এটা রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র বিছানা। সুতরাং আপনি কাফির ও নাপাক হয়ে কি করে এর মধ্যে বসতে পারেন? এতে আবু সুফিয়ান খুবই দুঃখিত হয়ে বলল, আমার

থেকে পৃথক হওয়ার পর তুমি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছ। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মর্যাদা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আসমানী বিবাহ

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর কুফাত বোন। তিনি ছিলেন ইসলামে প্রাথমিক যুগের মুসলমান। প্রথমে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হযরত যায়েদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস ও পৌষ্যপুত্র ছিলেন। তিনি যয়নব (রাঃ)-কে তালাক দিয়ে দেন। জাহেলিয়াত যুগে পৌষ্যপুত্রকে ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় মনে করা হত। তাই ছেলের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে অর্থাৎ পৌষ্যপুত্র বধুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এ কুসংস্কারকে খন্ডন করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের জন্য হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে হযরত যয়নব (রাঃ) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের সাথে একটু পরামর্শ করার কথা বলে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন কারীমে আয়াত নাযিল করে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত যয়নব (রাঃ) এর বিবাহের ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

যখন হযরত যয়নব (রাঃ)-কে যখন এ আয়াত নাযিল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হল, তখন আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায়ার্থে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং দু' মাস রোযা রাখার মানত করলেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর জন্য নিশ্চয় গৌরবের বিষয় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীগণের বিবাহ আত্মীয় স্বজনগণ পড়িয়েছেন কিন্তু তাঁর বিবাহ আসমানে হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মজীদে এ বিবাহ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং বলেন, (হে নবী!) আমি স্বয়ং যয়নবকে আপনার সাথে বিবাহে দিয়ে দিলাম। এ কারণেই তিনি হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে বলতেন, তোমার গৌরবের বিষয় হল এ যে, তুমি রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আর আমার গৌরবের বিষয় হল যে, তোমার বিয়ে জমীনে হয়েছে আর আর বিয়ে হয়েছে আসমানে।

হযরত খান্সা (রাঃ)-এর চার পুত্রসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত খান্সা (রাঃ) বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন। তিনি স্বগোত্রীয় কিছু সংখ্যক লোকসহ মদীনায় এসে মুসলমান হন। ইব্নে আসীর বলেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, হযরত খান্সা (রাঃ) থেকে উত্তম

কবিতা আর কোন নারী লিখেনি, তাঁর পূর্বেও না, আর পরেও না। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে ১৬ হিজরীতে কাদেসীয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংগঠিত হয় যার মধ্যে হযরত খান্সা (রাঃ)-তাঁর চার পুত্রসহ অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাওয়ার একদিন পূর্বে তিনি ছেলেদেরকে নসীহত করেন, তারা যেন বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে হিযরত করেছ, সে পবিত্র সত্ত্বার কসম! যিনি একমাত্র উপাস্য, যেভাবে তোমরা মায়ের উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছ, তদ্রুপ তোমরা একই পিতার সন্তান। আমি আমার চরিত্রের মধ্যে তোমাদের পিতার খিয়ানত করিনি অথবা আমি তোমাদের মামাদেরকেও অপমানিত করিনি। তোমাদের বংশগত মর্যাদায় কোন ত্রুটি নেই। তোমাদের জানা উচিত, কাফের-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কি কি সওয়ার নিহীত রয়েছে। তোমাদের এ কথাও জানা আছে যে, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে অনেক উত্তম। আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ করেন–"হে মুমিনগণ! তোমরা সব ধরনের কষ্টে ধৈর্যধারণ কর, বিশেষভাবে রণক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ কর আর কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাক। তবে তোমরা পরিপূর্ণ সফলকাম হবে।" অতএব আগামী কাল যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হবে, মোকাবেলা যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকবে তখন তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের ভীড়ে ঢুকে কাফেরদের সরদারের সাথে মোকাবেলা করবে। ইন্শাআল্লাহ্ তোমরা সফলকাম হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সুতরাং পরের দিন যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হল তখন চার ভাইয়ের মধ্যে এক একজন মায়ের নসীহতগুলো পাঠ করতে করতে আগ্রসর হত আর বীর বিক্রমে শত্রুর মোকাবিলা করত। একজন শহীদ হয়ে গেলে অপরজন মায়ের নসীহত গুলো আবৃত্তি করে করে মধ্যে শক্তি সঞ্চার করত আর বীর বিক্রমে শত্রুদের ভীরে ঢুকে মোকাবিলা করত এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হত না। এভাবেই একের পর এক চার ভাই শাহাদাত বরণ করলেন। যখন হযরত খান্সা (রাঃ)-এর কাছে তাঁর চারপুত্রের শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করে বললেন, তিনিই ছেলেদের শহীদ হওয়ার দ্বারা আমাকে সম্মানীত করেছেন। আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তায়ালা চার ছেলের সাথে আমাকেও তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

উপলব্ধি করায় বিষয় তাঁরা কেমন মা ছিলেন। চারটি ছেলে একই যুদ্ধে শহীদ হল, তাতেও আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন এবং নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) ও এক ইয়াহুদী হত্যা

হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর আপন ফুফু আর হযরত হামযা (রাঃ)-এর আপন বোন ছিলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে সকল মহিলাদেরকে একটি দূর্গের মধ্যে আবদ্ধ করে সখানে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে তাঁদের প্রহরী নিযুক্ত করেন। ইসলামের চির শত্রু ইয়াহুদীরা কেল্লার ভিতর শুধু মহিলাদের অবস্থান জানতে পেরে আর এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে হামলার পরিকল্পনা করে। এ উদ্দেশ্যে কেল্লার ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এক ইয়াহুদী কে নিয়োগ করে। হযরত সফিয়্যাহ্‌ (রাঃ)- তাবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-কে বললেন, তার মস্তক কেটে নিয়ে কেল্লার দেওয়ালেরর উপর দিয়ে যেখানে ইয়াহুদীরা সমবেত ছিল সেখানে নিক্ষেপ করতে। এ দৃশ্য দেখে ইয়াহুদীরাও বলাবলি করতে লাগল, আমরা পূর্বেই ভেবেছি, মুহাম্মদ দূর্গের ভিতর শুধু মহিলাদেরকে একা রেখে যাননি। নিশ্চয় তাঁদের সাথে পুরুষ রক্ষীরা রয়েছে।

হযরত সহিয়্যাহ্‌ (রাঃ) ২০ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। খন্দকের যুদ্ধ ৫ম হিজরীত অনুষ্ঠিত হয়। এ বয়সে একাই একজন শক্তিশালী পুরুষকে হত্যা করা কতটুকু সাহসের প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নারীদের নেকী সম্পর্কে প্রশ্ন

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান। আমি মুসলিম রমনীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি। আল্লাহ্‌ তায়ালা আপনাকে নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আর এ জন্য আমরা নারী সমাজ আপনার এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। আমরা পর্দার মধ্যে থেকে বাড়ী ঘর দেখা শোনা করি। আমাদের মাধ্যমে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়, তাদরে সন্তানদেরকে আমরা গর্ভে ধারণ করে থাকি। এসব কিছু সত্ত্বেও পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের তুলনায় নেক কাজে অগ্রগামী। যেমন ঃ তারা জুমার নামাযে শরীক হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে

জামাতে শরীক হয়, রুগী দেখতে যায়, জানায়ায় শরীক হয়, হজ্বের পর হজ্ব করতে থাকে, তদুপরি তারা জিহাদের অংশগ্রহণ করে। যখন তারা হজ্বে বা ওরমায় কিংবা জিহাদে যায় তখন আমরা নারীরা তাদের বাড়ী ঘর ও মাল আসবাবের হিফাযত করে সংসারের নানান কাজে লিপ্ত থাকি। এখন প্রশ্ন হল- আমরা কি তাদের নেক আমল সমূহের সওয়াবের মধ্যে অংশীদার হব না?

রাসূল (সাঃ) এ প্রশ্ন শুনে সাহাবায়ে কিরামদের দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কখনও দ্বীন সম্পর্কে এ মহিলার চেয়ে উত্তম প্রশ্ন করতে কখনও শুনেছ? সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের ধারণাও ছিল না যে, কোন নারী এরূপ প্রশ্ন করতে পারে? তারপর রাসূল (সাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) এর দিকে মুখ করে ইরশাদ করলেন, মনযোগ দিয়ে শুনে বুঝে নাও এবং যে সকল মহিলারা তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে বলে দাও যে, স্বামীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করা, যে কাজে স্বামী সন্তুষ্ট সে অনুযায়ী আমল করা এসব আমলের নেকীর সমান। হযরত আসমা (রাঃ) এ জওয়াব শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

নিজের স্বামীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করা অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু এ যুগে স্ত্রীগণ এর থেকে অনেক উদাসীন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) একবার রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, অন্যান্য জাতীয় লোকেরা তাদের বাদশাহের সিজদা করে থাকে কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশী যোগ্য যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি। রাসূল (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে আমি স্ত্রীগণকে হুকুম করতাম তারা যেন তাদের স্বামীগণকে সিজদা করে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যার কুদরতী হাতে আমার জীবন নারীরা ঐ পর্যন্ত তাদের রবের হক আদায়ে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের স্বামীদের হক আদায় না করে।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার একটি উট রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে সিজদা করল, তখন সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ উট একটি পশু হয়ে আপনাকে সিজদা করছে। অথচ আপনাকে সিজদা করার ব্যাপারে আমরাই বেশী উপযোগী। তখন রাসূল (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন, আমি যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তারা যেন তাদের

স্বামীদেরকে সিজদা করে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে স্ত্রী এরূপ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, স্বামী তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে স্ত্রী রাগ বশতঃ তার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে রাত্রি যাপন করে, ফেরেশ্তারা সারা রাত তার উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, দু'জন ব্যক্তির দোয়া কুবল হওয়ার জন্য আসমানের দিকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট) তার মাথা থেকে সামান্যতম উপরেও উঠে না। তম্মধ্যে একজন হল ঐ কৃতদাস যে তার মুনিব থেকে পালিয়ে যায় আর দ্বিতীয় জন হল ঐ স্ত্রী যে তার স্বামীর অবাধ্য।

উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) এ সকল আনসারী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান হয়েছেন। তিনি বাইয়াতুল আক্বাবায় শরীক ছিলেন। আক্বাবা শব্দের অর্থ ঘাঁটি। রাসূল (সাঃ) শুরুতে চুপে চুপে মুসলমান করতেন, কেননা তখন কাফের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর কঠিন নির্যাতন করত। হজ্ব মৌসুমে মদীনা থেকে যেসব লোক মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কায় আসতেন তাঁরা মিনায় পাহাড়ের ঘাটির মধ্যে চুপে চুপে মুসলমান হত। তৃতীয় বার যে দলটি মদীনা থেকে মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কায় এসেছিলেন তার মধ্যে হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)ও ছিলেন। হিযরতের পর যখন একের পর এক যুদ্ধ হতে লাগল, তখন তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে ওহুদ, হোদাইবিয়া, খায়বর, উমরাতুল কাযা, হোনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি তৃষ্ণার্ত ও আহতদেরকে পানি পান করানোর জন্য মশক ভরে পানি নিয়ে ওহুদে যাই। তখন আমার বয়স ৪৩ বছর। আমার স্বামী ও ছেলে এ যুদ্ধে শরীক ছিল। প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয়ী হচ্ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে কাফেররা শক্তিশালী আক্রমণ করল, তখন আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছাকাছি চলে গেলাম। যখন কোন কাফের আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেদিকে অগ্রসর হত, আমি তাকে হটিয়ে দিতাম। শুরুতে আমার কাছে ঢাল ছিল না, পরে যখন ঢাল সংগ্রহ হয়েছে তখন ঢালের মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিহত করেছি। কোমরের মধ্যে একটি কাপড় বেঁধে রেখেছিলাম তাতে অনেক নেকড়া

ছিল। যখন কেহ আহত হত তখন নেকড়া পুড়ে ক্ষতস্থানে ভরে দিতাম। আমার নিজেরও বার তেরটি স্থানে জখম হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল খুব গভীর। হযরত উম্মে সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর কাঁধে একটা বড় ধরনের যখম দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এত বড় যখমের ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল? তিনি বললেন, ওহুদ যুদ্ধে লোকজন যখন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল তখন ইব্নে কুমাইয়্যাহ্ এ বলে রাসূল (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল যে, আমাকে বল মুহাম্মদ (সাঃ) কোথায়? আজ তিনি যদি বেঁচে যান, তাহলে আমার রক্ষা নেই।

হযরত মুসআব ইব্নে ওমায়ের (রাঃ)-সহ আমরা কতিপয় লোক তার মুখোমুখী হয়ে গেলাম, সে আমার কাঁধে আঘাত করলে, আমি তার উপর কয়েকবার আঘাত করি। আমার কাঁধের যখমটি এত বড় ছিল যে, এক বছরেও তা ভাল হয়নি। এরই মাঝে রাসূল (সাঃ) হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)-ও প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু ক্ষতস্থান এত কাচা ছিল যে তাই অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে সর্ব প্রথম হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) এর খবর নেন এবং কিছুটা সুস্থতার সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। হযরত উম্মে হাকীক (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ যুদ্ধে স্বামী স্ত্রী উভয়ে শরীক হন। হযরত ইকরিমা (রাঃ) এ যুদ্ধে শহীদ হন। তারপর অলীদ ইব্নে সাঈদ (রাঃ) এর সাথেও তিনি যুদ্ধে শরীক হন। যুদ্ধে অলীদ ইব্নে সাঈদ (রাঃ) শহীদ হয়ে যান। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) স্বামীর সাথে যে তাবুর মধ্যে রাত্রি যাপন করেন, শত্রুবাহিনী তার মধ্যে হামলা করলে তুমুল লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে একাই সাত জনকে হত্যা করে।

হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ)-এর শাহাদত

হযরত আম্মার (রাঃ) এর মাতা ছিলেন হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ)। হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ)ও পুত্র আম্মার (রাঃ) এবং স্বামী হযরত ইয়াসের (রাঃ)-এর ন্যায় ইসলামের জন্য বিভিন্ন ধরনের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের সত্যিকার মহব্বত তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল ছিল, তাই যে কোন ধরনের কঠোর নির্যাতনেও তিনি ছিলেন অটল ও অটুট। তাঁকে আরবের অগ্নিসম প্রখর রোদ্রে গরম পাথরের চটানের উপর ফেলে রাখা হত, কখনও লোহার পোশাক পরিয়ে উত্তপ্ত রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হত যাতে লোহা গরম হয়ে কষ্ট হয়।

রাসূল (সাঃ) এসব দেখে তাঁকে ধৈর্যধারনের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের ওয়াদা করতেন। একবার হযরত সুমাইয়া (রাঃ) দাড়ানো অবস্থায় আর হঠাৎ করে আবু জাহ্‌ল সেখানে উপস্থিত হয়ে অকথ্য ভাষায় কতক্ষণ গালি গালাজ করে তাঁকে শহীদ করে দিল। একজন নারী হয়ে ইসলামের জন্য কি পরিমাণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরি:য় দিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আসমা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ)-এর জীবনে অনটন

হযরত আসমা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা এবং হযরত আয়িশা (রাঃ) এর বোন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর মাতা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবীদর মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ৭০ জনের পর তিনি মুসলমান হন। রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিযরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর হযরত যায়েদ (রাঃ)-সহ কয়েকজনকে তাঁদের পরিবার পরিজনের লোকদের নিয়ে আসার জন্য মক্কায় পাঠান। তাঁদের সাথে হযরত আসমা (রাঃ) ও মদীনায় চলে আসেন। তিনির গর্ভবতী ছিলেন আর কুবা নগরীতে পৌঁছালে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হিযরতের পর তাঁর জন্মগ্রহণই প্রথম। তখন মুসলমানগণ চরম অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সাহসিকতা ও ত্যাগ, ধৈর্যের কথা উদাহরণে আজ পরিণত হয়ে রয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন যে, যখন যোবায়েরের সাথে আমার বিবাহ হয়, তখন তিনি নিঃস্ব ছিলেন। শুধু একটি উট ছিল। আর বাড়ীর যাবতীয় কাজ নিজে করতাম। আমি ভালভাবে রুটি তৈরী করতে পারতাম না বলে প্রতিবেশী আনসারী মহিলারা রুটি তৈরী করে দিতেন।

মদীনায় রাসূল (সাঃ) যোবায়ের (রাঃ) কে একটি জমিন দিয়েছিলেন, যা বিরাট প্রশস্ত ছিল। আমি সেখান থেকে খেজুর মাথায় করে নিয়ে আসতাম। রাসূল (সাঃ) আমাকে দেখে ফেলেন। তিনি আনসারদের এক জামাতের সাথে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসছিলেন। আমাকে তিনি উটে আরোহন করতে বলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বসতে আমার লজ্জা হল। এটা বুঝতে পেরে তিনি চলে গেলেন। আমি ঘরে এসে যোবায়ের (রাঃ)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। যোবায়েব (রাঃ) আমাকে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললাম তোমার মনে কষ্ট পাবে তাই আমি বসিনি। তখন যোবায়ের (রাঃ) বলল, তোমার মাথার উপর গাঠুরী নিয়ে আসা আমার মনে এর চেয়েও বেশী কষ্ট হয়। এ সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের করার কিছুই ছিল কেননা, তাঁরা অধিকাংশ সময়

জিহাদের কাটিয়ে দিতেন তাই, বাড়ী ঘরে যাবতীয় কাজ কাম মহিলাদেরই করতে হত। কিছুদিন পর আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার জন্য একটি খাদেম পাঠিয়ে দেন। আর এ খাদেমটি রাসূল (সাঃ) তাঁকে দিয়েছিলেন। খাদেম আসার পর থেকে ঘর-বাড়ীর কাজ-কর্ম থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছি। এ হল তখনকার যুগে মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যার জীবন যাপনের চিত্র।

হিযরতের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) এর সাথে হিযরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন তাঁর সমস্ত মাল সাথে নিয়ে নিলেন এ ভেবে যে, কত দিনের সফর আর কখন কি প্রয়োজন জানা নেই। রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর বিদায় হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পিতা আবু কুহাফা (তখন পর্যন্ত মুসলমনা হননি এবং অন্ধ ছিলেন) নাতনীদের কাছে এসে আফসোস করতে লাগল যে, আবু বকর (রাঃ) সন্তানদের থেকে বিচ্ছিনন্ন হয়ে সমস্ত মাল সাথে নিয়ে গেছে। দাদার এ কথা শুনে হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, তিনি তো অনেক কিছুই রেখে গেছেন, এরপর দাদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আব্বা তখন কিছুই রেখে যাননি। আমি শুধু দাদাকে শান্তনা দেয়ার জন্য এরূপ বলেছিলাম। যাতে তিনি মর্মাহত না হন।

কত বড় ত্যাগ স্বীকার ও এমতাবস্থায় তো দাদার কাছে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কথা ছিল। কেননা জীবিকা নির্বাহের জন্য যে অর্থ ছিল তা তিনি পুরোটাই নিয়ে গেছেন। এদিকে মক্কার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। আসল কথা হল সাহাবায়ে কিরাম পুরুষ হোক আর মহিলাই হোক দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর বিষয়ে তাঁদের উদাহরণ তাঁরাই ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) শুরুতে অত্যন্ত বিত্তশালী ও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য প্রয়োজনে এ পরিমাণ খরচ করেছেন যে, তাবুকের যুদ্ধে সমুদয় মাল রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত পেশ করেন। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি অন্য কারও সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণে উপকৃত হই নাই, যে পরিমাণে আবু বকরের মাল দ্বারা হয়েছি এবং আমি প্রত্যেকের এহসানের প্রতিদান দিয়েছি কিন্তু আবু বকরের ইহসান আমার উপর এত বেশী যে, তাঁর প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না, আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

স্বামীর মুক্তিপণে হযরত যয়নব (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর প্রথম সন্তান হযরত যয়নব (রাঃ) হিজরতের দশ বছর পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর ৩০ বছর বয়সে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। খালাত ভাই আবুল আ'স ইব্‌নে রাবী'র সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হিজরতের সময় তিনি রাসূল (সাঃ) সাথে যেতে পারেন নি। স্বামী আবুল আ'স কাফেরদের পক্ষে বদরের যুদ্ধে শরীক হয় এবং অন্যান্য কাফেরদের সাথে বন্দী হয়ে মদীনায় আনীত হয়। মক্কা বাসীরা যখন মুক্তিপণ দিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনকে আযাদ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হযরত যয়নব (রাঃ) ও স্বামীর মুক্তির জন্য মাল পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে এ হার খানিও ছিল যা হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) তাঁকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সামনে যখন সে হারটি পেশ করা হল তখন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কথা মনে পড়ে যায় এবং রাসূল (সাঃ)-এর দু' চোখ বয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের বললেন, যয়নাবের পাঠানো মাল ফেরত দাও আর আবুল আ'সকে এ শর্তে মাল ছাড়াই মুক্ত করে দাও যে, সে মক্কায় যেয়ে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। রাসূল (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে আবুল আ'সের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এ বলে যে, তারা মক্কার বাইরে অপেক্ষা করবে আর আবুল আ'স যয়নবকে তাদের কাছে পৌছিয়ে দিবে। মক্কায় পৌছে আবুল আ'স তার ছোট ভাই কানানার সাথে যয়নব (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দেয়। হযরত যয়নব উটের পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হন। হযরত যয়নব (রাঃ) এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে হিজরত করে চলে যাচ্ছেন এ খবর ছাড়িয়ে পড়লে মক্কার কাফের মুশরিকরা ক্ষোভে ও রাগে ফেটে পড়ে। তারা যয়নব (রাঃ)-কে ধাওয়া করে। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর মামাত ভাই হিবার ইব্‌নে আসওয়াদ আর এক সঙ্গী সহ তাঁর উপর বর্শা দ্বারা আক্রমণ করলে তিনি গুরুতর আহত হয়ে উটের পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়েন। তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এ মর্মান্তিক ঘটনায় তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তিনি শত্রুর সাথে তীরের সাহায্যে মোকাবিলা করেন। আবু সুফিয়ান তাকে বলে যে, এ ভাবে প্রকাশ্যে মুহাম্মাদের কন্যাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তোমরা এ মুহূর্তে ফিরে যাও। পরে কখনো চুপে চুপে পাঠিয়ে দিও। তাই তারা বড়ী ফিরে যান এবং দু'তিন পর পুনরায় রওয়ানা হন। অবশেষে ৮ম হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং কবরে নেমে তাঁকে দাফন করেন। কবরে নামার সময় তাঁকে খুব চিন্তিত দেখা গেছে কিন্তু কবর থেকে বের হয়ে আসার পর রাসূল (সাঃ) এর চেহারায় খুশীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। উভয় অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জয়নবের ব্যাপারে আমার একটু চিন্তা ও দূর্বলতা ছিল। আর এখন তা দূর হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

সাহাবা যুগে শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় ভাবধারা

আগেকার যুগে শিশু কিশোরদের মাঝে যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় মূলতঃ তা ছিল অভিভাবকদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা পথ নির্দেশনার ফসল। শৈশবেই যদি অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে মাত্রারিক্ত সোহাগ করে ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান হাসিল করার সুযোগ করে দেন এবং ধর্মীয় মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস পান তাহলে শিশুকাল থেকেই তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি ধর্মীয় অনুভুতি বদ্ধমূল হতে থাকে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরও তার মাঝে সে অনুভূতিই তাকে পরিচালিত করে। কিন্তু আমরা প্রথমেই স্নেহ মমতায় আত্মহারা হয়ে সন্তানদেরকে উশৃংখল ভাবে ছেড়ে দেই, আর মনে করি বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং এরূপ অবস্থা আর থাকবে না। কিন্তু এ ধারণাটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাথমিক স্তর থেকেই সন্তানদেরকে দ্বীনিশিক্ষা দান ও আমলের অভ্যাস করানো অভিভাবকদের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামগণ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একবার রমযান মাসে শরাব পানের অপরাধে জনৈক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত করা হল। তিনি বললেন, ছিঃ! লজ্জা করা উচিত, আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোযাদার। অপরাধের শাস্তি স্বরূপ লোকটিকে আশিটা বেত্রাঘাত করে মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন।

শিশুদের রোযা

রুকাইয়া বিন্‌তে মুআব্বিয (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, আজ আশুরার দিন, সবাই রোযা রাখ। এরপর থেকে আমরা সবাই আশুরার রোযা রেখেছি, শিশুরদেরকেও বলেছি, তারাও রোযা রেখেছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় শিশুরা কান্নাকাটি করলে, আমরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে শান্ত করতাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই ক্ষুধা যন্ত্রণার কষ্ট ভুলিয়ে রাখতাম। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, মায়েরা রমযান মাসে সন্তানদেরকে দুধ পর্যন্ত খাওয়াতেন না। এতে সন্দেহ নেই যে, সেকালে মা শিশু উভয়ের শক্তি সামর্থ বর্তমান যুগের

তুলনায় ছিল বেশী। কিন্তু বর্তমান যুগে যাদের দ্বারা সম্ভব সেসব শিশুদের রোযা রাখানোর ব্যাপারে অভিভাবকগণ কতটুকু চেষ্টা করেন বা তাকিদ দেন, সেটাই চিন্তার বিষয়।

হাদীস বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ মাত্র ছয় বছর বয়সে এবং নয় বছর বয়সে মদীনায় রুখসতী হয় আর আঠার বছর বয়সে রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়। এত অল্প বয়সে হযরত আয়েশা (রাঃ) অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মাসরুক (রঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) সাহাবাদের মধ্যে সুবিজ্ঞ আলেম ছিলেন। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর কাছে মাস্‌আলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, যখন কোন মাস্‌আলা সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিত, তখন হযরত আযেশা (রাঃ)-এর কাছে তার সমাধান পাওয়া যেত। অন্তত দু'হাজার দু'শত হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, শিশুকালে আমি একবার মক্কা মুকাররমায় খেলা-ধুলা করছিলাম, এ সময় রাসূল (সাঃ)-এর উপর সূরা কামারের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন। এত অল্প বয়সে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া, তা আবার মুখস্থ রেখে সংরক্ষণ করা দ্বীনের সাথে গভীর সুসম্পর্ক থাকলেই সম্ভব।

কিশোর বয়সে বদর যুদ্ধে যোগদান

হযরত সা'আদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতির দিন আমি দেখলাম আমার ভাই ওমায়ের (রাঃ) চুপে চুপে শুধু গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাফিরা করা অবস্থায় আমি আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, ছোট শিশু মনে করে রাসূল (সাঃ) যুদ্ধে হয়ত আমাকে নাও নিতে পারেন, অথচ আমার মন চায় যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়। যা ভয় ছিল তাই হল। রাসূল (সাঃ) অল্প বয়স্ক হবার কারণে বাদ দিলে তিনি কাঁদতে লাগলেন তাঁর আগ্রহ দেখে অবশেষে রাসূল (সাঃ) অনুমতি দিলেন। হযরত সা'আদ (রাঃ) বললেন সে ছোট ছিল, আর তলোয়ার ছিল বড়, তাই আমি তলোয়ারের রশিতে গিরা লাগিয়ে দিলাম যাতে মাটিতে না ঠেকে।

আবু জাহ্‌লের হত্যাকারী দু'শিশু

আবদুল্লাহ্‌ রহমান ইব্‌নে আঊফ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হঠাৎ আমার দু'পার্শ্বে দু'টি অল্প বয়স্ক শিশুকে দেখতে পেলাম। ভাবলাম শিশু না হয়ে যদি দু"জন বলিষ্ট লোক হত, তাহলে হয়ত একে অপরের সাহায্য করতে পারতাম। ইত্যবয়সে একটি ছেলে বলে উঠল, চাচা! আপনি কুখ্যত আবু জাহ্‌লকে চিনেন? আমি বললাম নিশ্চয়! কিন্তু তুমি তার পরিচয় দিয়ে কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নাকি আমার প্রিয়নবী (সাঃ)-কে অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করে। আমি আল্লাহ্‌র পাক জাতের কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আজ আমি তাকে দেখা মাত্র আর ছাড়ব না। হয়ত আমি মরব না হয় তাকে জাহান্নামে পাঠাব। ছেলেটির প্রশ্নোত্তরে আমি আশ্চর্য হলাম। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রথমটির প্রশ্নোত্তর করল। আমি হঠাৎ করে আবু জাহ্‌লকে ময়দানে দৌড়াতে দেখে উভয়কে বললাম, এ যে, তোমাদের শিকার যাচ্ছে। শুনামাত্র ছেলে দু'টি তলোয়ার হতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে আবু জাহ্‌লের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং লড়তে লড়তে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। বাচ্চা দু'টির নাম হল, মুআয ইব্‌নে আমর আর মুআয ইব্‌নে ইফরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। বাচ্চা সৈনিক হযরত মুআয ইব্‌নে আমর (রাঃ) বলেন, আমি লোক মুখে শুনলাম, আবু জাহল এত শক্তিশালী যে তাকে নাকি কেউ মারতে পারবে না। কারণ, সে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নিজেকে হিফাযত করে। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে মারবই মারব। যুদ্ধের ময়দানে এ ছেলে দু'টি ছিল পদাতিক আর আবু জাহল ছিল ঘোড়ার পিঠে। আবু জাহল কে দেখা মাত্র একজন বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে তার ঘোড়ার উপর হামলা করল অপর জন আবু জাহলের পায়ে আঘাত হানল, এতে ঘোড়াও পড়ে গেল, আবু জাহলও কাবু হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সে যেন পুনরায় উঠে দাঁড়াতে না পারে, মুআয ইব্‌নে ইফরার ভাই তার উপর ক্রমাগত কয়েকটি আঘাত করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু জাহল নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে খতম করলেন না।

অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) তার গর্দান দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন। হযরত মুআয ইব্‌নে আমর (রাঃ) বলেন, যখন আমি আবু জাহলের গায়ে আঘাত করি তখন তার ছেলে ইকরামা পাশেই ছিল, সে আমার কাঁধে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলে আমার একটি হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হাতটি সামান্য চামড়া সাথে ঝুলে থাকে, যা আমি পিঠের দিকে ফেলে রাখি। আর এক হাতেই যুদ্ধ করতে থাকি। যখন অধিক কষ্ট হতে লাগল, তখন পায়ের নীচে রেখে তা ছিড়ে ফেলে দেই।

রাসূল (সাঃ)-এর পাহারাদার

হযরত রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যখন কোন অভিযানে মদীনা থেকে বের হতেন তখন সৈন্যদল পর্যবেক্ষণ করে দেখতেন। দলে অল্প বয়স্ক কোন ছেলে থাকলে তাকে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এ যুদ্ধে যাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর, যায়েদ ইব্‌নে সাবিত, ওসামা ইব্‌নে যায়েদ, যায়েদ ইব্‌নে আকরাম, বারা ইব্‌নে আযেব, আমর ইব্‌নে হেজাম, উসায়েদ ইব্‌নে যোহায়ের, আরাবা ইব্‌নে আওস, আবু সাঈদ খুদরী, সামুরা ইব্‌নে জুন্‌দুব এবং রাফে ইব্‌নে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম আজমায়ীন)। ফেরত পাঠানোর নির্দেশ শুনে হযরত খাদীজ (রাঃ) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ছেলে রাফে অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজ তাকে অনুমতি দিন, এদিকে হযরত রাফে (রাঃ) ও পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে উচু হয়ে দাড়ানোর চেষ্টা করছিল যাতে তাকেও বড়দের মত দেখা যায়। পিতার সুপারিশে রাসূল (সাঃ) রাফে' (রাঃ)-কে অনুমতি দিলেন। এ দেখে হযরত সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রাঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, রাসূল (সাঃ) রাফে' কে অনুমতি দিলেন, অথচ আমি রাফে' থেকে অধিক শক্তিশালী। তাঁর সাথে কুস্তি মোকাবিলা হলে, আমি অনায়াসে তাকে হারিয়ে দিব। একথা শুনে রাসূল (সাঃ) উভয়ের মধ্যে কুস্তির আদেশ দিলেন। সত্যিই হযরত সামুরা (রাঃ) হযরত রাফে (রাঃ)-কে পরাজিত করলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) তাকেও অনুমতি দিলেন।

অতপর আরো কয়েকজন ছেলে চেষ্টা করে এরূপে অনুমতি লাভ করল। এভাবে প্রস্তুতির ব্যস্ততায় রাত হয়ে গেল। রাসূল (সাঃ) সৈন্যদলের পাহারার জন্য পঞ্চাশ জনকে নিযুক্ত করে দিলেন। অতপর বললেন, আজ রাতে কে আমাকে পাহারা দিবে? একজন সাহাবী দাঁড়ালেন। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, যাকওয়ান। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি বস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে আমার পাহারায় কে থাকবে? এবারও একজন সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, তোমার নাম কি? সাহাবী বললেন, আবু সাব্‌আ। তিনি বললেন, আচ্ছা তুমিও বস। রাসূল (সাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে আমাকে কে পাহারা দিবে? এবারও একজন সাহাবী দাঁড়ালেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ইব্‌নে আবদুল কায়েস। রাসূল (সাঃ) বললেন, আচ্ছা বস। কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাসুল (সাঃ) বললেন, তোমরা তিন জন আমার কাছে এস। তখন মাত্র এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অপর

দু'জন সাথী কোথায়? নবীজীর জন্য জান উৎসর্গকারী সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রত্যেক বার আমি একাই উঠেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করে, পাহারায় নিযুক্ত করেন। তিনি সারা রাত জেগে রাসূল (সাঃ-এর তাঁবু পাহারা দিলেন। দ্বীনের জন্য আগ্রহ ও উদ্দীপনার এটাই ছিল অপূর্ব নিদর্শন। তাঁদের ধর্মের খাতিরে আপন জান কুরবান করাই ছিল যেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই সফলতা তাঁদের পদচুম্বন করত।

কুরআন মজীদ বেশী তিলাওয়াত করার মর্যাদা

হিযরতের সময় হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-এর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। সে সময় তিনি হিযরত করেন। ছয় বছর বয়সে এতিম হন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে ছোট হওয়ায় শরীক হওয়ার অনুমতি পাননি। অবশ্য এর পর থেকে সমস্ত অভিযানে তিনি যোগদান করেন। তাবুকের যুদ্ধে বনী মালেকের পতাকা হযরত আম্মারা (রাঃ)-এর হাতে ছিল। রাসূল (সাঃ) এ পতাকা তাঁর হাত থেকে নিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হাতে দিন। এতে হযরত আম্মারা (রাঃ) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তিনি ভাবলেন, হয়ত আমার দ্বারা কোন বে-আদবী হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দরবারে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এসেছে কি? রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তবে যায়েদ কোরআন মজীদ তোমার চেয়ে বেশী পড়েছে। কুরআন মজীদ তাঁকে ইসলামের পতাকা বহন করার জন্য অগ্রগামী করবে। রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহাবাদেরকে দ্বীনের কারণে অগ্রাধিকার দিতেন। যাঁরা কুরআন মজীদ অধিক পরিমাণে শিখেছেন তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতার ইন্তিকাল

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধে শরীক হবার জন্য আমাকে হুকুম করা হল। তখন আমার বয়স মাত্র তের বছর ছিল, তাই রাসূল (সাঃ) অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা এ বলে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ। ছেলেটি বেশ শক্তিশালী এবং তার হাড়ও খুব শক্ত। রাসূল (সাঃ) আমার দিকে উপর নীচে বার বার তাকিয়ে অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তিনি আমাদের জন্য কোন সম্পদ রেখে যাননি। আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য হাযির হলাম। রাসূল (সাঃ বলেন, যে আল্লাহ্‌র কাছে সবর চায় তাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সবর প্রদান করেন। যে পবিত্রতা চায়, তাঁকে পবিত্রতা দান করেন। আর যে আত্মনির্ভরতা চায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আত্মনির্ভরশীল করেন। আবু সাঈদ

খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর নসীহত শুনে চুপে চুপে ফিরে এলাম। তার পর আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, যুবক সাহাবাদের মধ্যে অন্য কেহ সে মর্যাদায় পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। অল্প বয়স, পিতৃহারা ও কপর্দকহীন বালক, অথচ রাসূল (সাঃ)-এর একটিমাত্র নসীহত শুনে নিরবে ফিরে আসা এবং নিজের অভাব অনটনের কথা প্রকাশ পর্যন্ত না করা বর্তমান যুগে কোন বয়স্ক লোকের পক্ষেও কি সম্ভব? বাস্তবিকই মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবীর সহচর হবার জন্য এমন মহাপুরুষদেরকে নির্বাচন করেছিলেন যাঁরা এর যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আমার সাহাবাদেরকে বাছাই করেছেন।

হযরত সালমা ইব্নে আক্ওয়া (রাঃ) এর গাবা প্রান্তরে দৌড়

মদীনা মুনাওযারা থেকে চারপাঁচ মাইল দূরে গাবা প্রন্তরে রাসূল (সাঃ)-এর উটসমূহ বিচরণ করত। আবদুর রহমান ফাযারী কাফেরদের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে সেখানকার উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। তারা সবাই সশস্ত্র অশ্বারোহী ছিল। হযরত সালমা ইব্নে আক্ওয়া (রাঃ) তীর ধনুক নিয়ে সকাল বেলা সেদিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ লুণ্ঠনকারী কাফেরদের এ দলের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল । তিনি অল্প বয়স্ক বিধায়, দৌড়ে খুবই পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে, দৌড়ে ঘোড়া তাকে অতিক্রম পারত না, তদুপরি অত্যন্ত সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি এ দুর্ঘটনা দেখে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে মদীনার দিকে মুখ করে এক বিকট শব্দে চিৎকার করে রাসূল (সাঃ)-এর উট লুট হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করলেন এবং একাই তীর ধনুক নিয়ে ডাকাত দলের পিছনে ধাওয়া করলেন। তাদের নিকটবর্তী হয়ে এমন বিচক্ষণতার সাথে তড়িৎগতিতে তীর ছুড়তে লাগলেন যে, শত্রু দল তাকে একটি বড় দল মনে করতে লাগল। কেহ পিছনের দিকে ঘোড়া দৌড়িয়ে তার দিকে আসলে তিনি কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তীর মেরে ঘোড়াকে আহত করে ফেলতেন। ফলে আরোহী ধরা পড়ার ভয়ে ঘোড়া রেখেই ছুটে পলায়ন করত। হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, এরূপ আক্রমণ চলতে চলতে রাসূল (সাঃ) এর সমস্ত লুণ্ঠিত উট আমার পিছনে চলে যায়। ডাকাতরা ত্রিশটা বর্শা এবং ত্রিশখানা চাদর ফেলে গেল। ইত্যবসরে উয়াইনা ইব্নে হিস্নের নেতৃত্বে একটি দল শত্রু বাহিনীর সাহাযার্থে উপস্থিত হল। এতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং তারা এটাও বুঝে ফেলল যে, আমি একাই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। তারা আমাকে পিছন দিক থেকে ধাওয়া করল। আমি মুহূর্তের মধ্যে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। তারাও পাহাড়ে আরোহণ করে আমার নিকটবর্তী হলে আমি দুর্জয় সাহসে বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছেড়ে বললাম,

তোমরা কি আমাকে চিন্তে পেরেছ আমি কে? তারা বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সালমা ইব্নে আকওয়া। আল্লাহ্র কসম, যিঁনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ইজ্জত দান করেছেন. তোমরা শত চেষ্টা করলেও আমাকে পাকড়াও করতে পারবে না, আর আমি তোমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করতে পারব, সে কিছুতেই আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, তাদের সাথে আমার কথা কাটাকাটির উদ্দেশ্য ছিল,যাতে ইতিমধ্যেই মদীনা থেকে আমার জন্যও সাহায্য এসে যায়। আমি মাঝে মাঝে গাছের আড়াল দিয়ে মদীনার দিকে দেখতাম, হঠাৎ একদল অশ্বারোহী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হল, যার অগ্রভাগে আখ্রাম আসাদী (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা দ্রুত গতিতে শত্রু বাহিনীর নিকটবর্তী হয়ে গেলেন।

হযরত আখ্রাম আসাদী (রাঃ) এসেই শত্রু বাহিনীর সর্দার আবদুর রহমানের ঘোড়া আহত করল, কিন্তু সে পাল্টা আক্রমণ করে হযরত আখ্রাম (রাঃ)-কে শহীদ করে, আখ্রাম (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই হযরত আবু কাতাদা আবদুর রহমানের উপর হামলা করলেন, কিন্তু আবদুর রহমান পাল্টা হামলা করে হযরত আবু কাতাদা এর ঘোড়ার পা কেটে ফেলল। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে দুর্বার গতিতে উঠেই আবদুর রহমানের উপর পুনরায় আক্রমণ করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি হযরত আখ্রাম আসাদী (রাঃ)-এর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। এ যুদ্ধে শুধু আখ্রাম (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন, আর কাফেরদের পক্ষে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। শত্রুরা পলায়ন করার পর হযরত সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করলেন যে, আমার সাথে একশত লোক দিন আমি তাদের ধাওয়া করব। রাসূল (সাঃ) বললেন, তারা এতক্ষণে নিজেদের দলেই পৌঁছে গেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত সালমা (রাঃ) এর বয়স তখন মাত্র তের বছর ছিল। এ ক্ষুদ্র বয়সে এত বড় অশ্বারোহী দলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা এবং এত বড় শত্রু বহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করা মূলতঃ এসব সাহাবাদের ইখলাসের বদৌলতেই সম্ভব ছিল।

বদরের যুদ্ধে হযরত বারা (রাঃ)-এর আগ্রহ

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ট। এতে মাত্র তিন শত তের জন মুসলিম মুজাহিদের কঠোর মোকাবিলা হয় এক হাজার সৈন্যের বিশাল সশস্ত্র বহিনীর সাথে। মুসলমানদের ছিল মাত্র তিনটি ঘোড়া, ছয়টি বা নয়টি লোহার পোশাক, আটটি তরবারী এবং সত্তর টি উট। এক একটির উপর কয়েক জন লোক পালাক্রমে সওয়ার হতেন। পক্ষান্তরে কফেরদের ছিল একশত ঘোড়া,

সাতশত উট এবং পর্যাপ্ত রণসামগ্রী, তদুপরি তারা রণবাদ্য বাজিয়ে গায়িকাদের গান বাজনা সহকারে রণক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল। এদিকে রাসূল (সাঃ) সাহাবা (রাঃ)-দের দুর্বলতা উপলব্ধি করে প্রবল উৎকণ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে ফরিয়াদ করলেন, হে আমার রব! এ অসহায় মুসলিম সেনাদল নগ্নপদ, তুমি তাঁদের সওয়ারীর ব্যবস্থা কর, এরা বস্ত্রহীন, তুমিই তাঁদের বস্ত্রের ব্যবস্থা কর। এরা ক্ষুধার্ত, তুমিই তাঁদের ক্ষুধা নিবারণ কর। এরা অর্থহীন, তুমিই তাঁদের অর্থশালী করে দাও। আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করলেন এবং সাহাবাদের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিলেন। এত কঠিন যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর ও বারা ইব্‌নে আযেব এই দু'জন অল্প বয়স্ক সাহাবী প্রবল আগ্রহ সহকারে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে। রাসূল (সাঃ) অনুমতি না দিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ দু'জনকে উহুদের যুদ্ধেও অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ উহুদের যুদ্ধ বদর যুদ্ধের এক বছর পর সংঘটিত হয়েছে। এসব সাহাবায়ে কিরামের শিশু কাল থেকেই দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্বেও তাঁরা যুদ্ধে শরীক হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশে বার বার অনুমতি চাইতেন।

মুনাফিক সরদার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ঘটনা

হিজরী ৫ম সনে বিখ্যাত বনু মস্‌তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পরস্পরে এক মুহাজির ও এক আনসারীর সাথে সামান্য একটি বিষয় নিয়ে বাক বিতন্ডা হয়। উভয়ে নিজ গোত্রের লোকদের কাছে সাহায্য কামনা করে এবং উভয় পক্ষে দু'টি দল তৈরী হয়। কিন্তু কয়েক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ঝগড়া মিটমাট হয়ে যায়। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হল, তখন সে রাসূল (সাঃ)-এর শানে অনেক বে-আদবী ও অভদ্র শব্দ ব্যবহার করল। সে বাহ্যতঃ নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, তাই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত না। সাধারণতঃ সমস্ত মুনাফিকদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা হত। তাই আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই বে-পরওয়া অশোভনীয় কথাবার্তা বলে। সে আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলল, এসব তোমাদের কৃতকর্মের ফসল। তোমরাই এসব লোককে নিজের শহরে আশ্রয় দিয়েছ। অর্ধেক ধনসম্পদ তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। এখনও যদি তোমরা তাঁদেরকে সাহায্য করা ত্যাগ কর তবে তাঁরা এ শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম মদীনায় পৌঁছে আমরা সম্মানিতগণ মিলে এসব

অপদস্ত লোকদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিব। হযরত যায়েদ ইব্‌নে আকরাম (রাঃ) অল্প বয়স্ক বালক তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন । এ কথা শুনে সহ্য করতে না পেরে ক্ষুব্দ হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম তুই অসভ্য, অভদ্র, আপন গোত্রের লোকদের মাঝেও তুই হেয় প্রতিপন্ন ও অপদস্ত। আমার রাসূল (সাঃ) সম্মানিত। আল্লাহ্‌ তাঁকে সম্মান দান করেছেন। তিনি স্বগোত্রিয় লোকদের মাঝেও সম্মানিত। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই বলল, বেটা! তুমি তো বুঝতেই পারনি। আমি তো এমনিই একটু হাসি মজাক করছিলাম কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অনুমতি হলে এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দিব। এদিকে দুষ্টমতি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উবাই যখন জানতে পারল যে, রাসূল (সাঃ) ঘটনা সম্পর্কে জেনে ফেলেছেন। তখন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওসব বাজে কথা, যায়েদ আপনার কাছে সাজিয়ে মিথ্যা কথা বলেছে। আনসারদের কিছু লোক এসে সুপারিশ করলেন যে, ইব্‌নে উবাই কওমের সর্দার, সবাই তাকে বড় মনে করে। তাই একটি বাচ্চার কথা তার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। সম্ভবতঃ সে ভুল শুনেছে অথবা বুঝার মধ্যে কিছুটা ভুল হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) যখন শুনলেন যে, দুষ্ট ইব্‌নে উবাই মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেকে সত্যবাদী প্রকাশ করেছে, তখন তিনি লজ্জায় ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। এমনকি লজ্জায় রাসূল (সাঃ)-এর দরবারেও আসা বন্ধ করে দিলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ সূরা মুনাফিকুন নাযিল করে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সত্যতা এবং মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই এর মিথ্যাচারিতা প্রকাশ করে দিলেন। এতে শত্রু মিত্র সবার মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই সবার মাঝে চরমভাবে অপদস্ত হল। ঘটনার দিন তার ছেলে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) যিনি খাটি মুসলমান ছিলেন, খোলা তরবারী হাতে নিয়ে মদীনার প্রবেশ পথে দাড়িয়ে পিতাকে বললেন, আমি তোকে ঐ সময় পর্যন্ত মদীনায় ঢুকতে দিবনা যতক্ষণ পর্যন্ত তুই স্বীকার না করবি যে, তুই অপদস্ত আর মুহাম্মদ (সাঃ) সম্মানিত। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, ছেলেটি তো আমার বাধ্যগত, কখনও বে-আদবী করেনি। তার বুঝতে বিলম্ব হলনা যে, রাসূলুল্লাহর শানে বে-আদবী সে সহ্য করতে পারেনি। অবশেষে পিতা বাধ্য হয়ে স্বীকার করল যে, আমিই নিকৃষ্ট, অপদস্ত আর মুহাম্মদ (সাঃ) উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত। তারপর সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারল।

হামরাওল আসাদ অভিযানে হযরত জাবের (রাঃ)-এর অংশ গ্রহণ

উহুদ যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কিরাম মাত্র মদীনায় ফিরেছেন। এ মুহূর্তে হঠাৎ সংবাদ এল যে, আবু সুফিয়ান হামরাওল আসাদ নামক স্থানে মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এবং (নাউযুবিল্লাহ) রাসূল (সাঃ)-কে কতল করার উদ্দেশ্য পুনরায় মদীনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা দিলেন যে, যাঁরা উহুদে শরীক ছিল, শুধুমাত্র তারাই এ যুদ্ধে শরীক হবে। ক্ষত বিক্ষত, আহত এবং রণক্লান্ত জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)-এর ঘোষণায় মুহূর্তের মধ্যেই হামরাওল আসাদ অভিমুখে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হযরত যাবের (রাঃ) এসে আরয করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহুদে শরীক হবার আমার প্রচন্ড আকাঙ্খা ছিল কিন্তু আমার পিতা আমাকে এ বলে অনুমতি দেননি যে, আমার সাতটি বোন বাড়িতে। অন্য কোন পুরুষ লোক নেই, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে? তিনি একাই শরীক হলেন আর শহীদ হয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুলুল্লাহ! অনুগ্রহ করে এ অভিযানে আমাকে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। রাসূল (সাঃ) তাঁর আগ্রহ দেখে অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত যাবের (রাঃ) এর ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্খা লক্ষ্যনীয়। যুদ্ধে পিতা শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে পিতা অনেকগুলো ঋণ রেখে গেছেন তাও আবার এক ইহুদী থেকে, যে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের ছিল। তদুপরি সাতটি বোনের ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের আগ্রহ সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

রোম যুদ্ধে হযরত ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর বীরত্ব

২৬ হিজরী। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে আ'মর ইব্‌নে আ'সের পরিবর্তে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবি মারাহ তখন মিশরের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন তিনি রোমীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। রোমীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লক্ষ। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। রোমান বাদশাহ জারজীর ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবি সারাহর মস্তক এনে দিতে পারবে তার কাছে আমার কন্যা বিবাহ দিব এবং তাকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। এতে মুসলিম সৈন্যদলে চিন্তার সঞ্চার হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) বললেন, এতে বিচলিত

হবার কোন কারণ নেই। আমাদের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হোক, যে ব্যক্তি জারজীরের মাথা এনে দিতে পারবে, জারজীরের কন্যা তাকেই দান করা হবে এবং লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। তদুপরি তাকে এ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হবে। উভয় পক্ষে দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) দেখলেন, জারজীর একা সৈন্যবাহিনীর পিছনে। দু'জন বাদী ময়ূরের পাখা দিয়ে তাকে ছায়া করে আছে। তিনি সবার অলক্ষ্যে তার উপর হামলা করলেন এবং তার মস্তক কেটে বর্শার মাথায় ঝুলিয়ে নিয়ে আসলেন। সবাই তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জারজীর ভেবেছিল তিনি হয়ত কোন সন্ধির আলোচনা করতে তার কাছে এসেছেন। কিন্তু কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনি তাকে হত্যা করে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

হিযরতের পর মক্কাবাসী মুহাজিরীনদের প্রথম সন্তান হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ। হিযরতের পর এক বছর পর্যন্ত মুহাজিরীনদের কোন পুত্রসন্তান না হওয়ার করণে ইহুদীরা দাবী করেছিল যে, তাদের উপর আমরা যাদু করেছি। এ কারণেই তাদের কোন ছেলে সন্তান জন্ম হয় না। কোন শিশু শিশুকে রাসূল (সাঃ) বাইয়াত করাতেন না। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-কে তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে বাইআত করান। এ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর ছিল। এ বয়সে দু'লক্ষ সৈন্যকে ডিঙ্গিয়ে বাদশাহর মাথা কেটে আনা সহজ ব্যাপার নয়।

কাফের অবস্থায় কুরআন মুখস্ত

হযরত আ'মার ইব্‌নে সালমা (রাঃ) বলেন আমরা মদীনায় এক স্থানে বসবাস করতাম। আমাদের পাশদিয়ে মদীনাবাসীরা আসা যাওয়া করত। মদীনা থেকে আসার পথে লোকজনদেরকে নবীজী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বলত, তাঁর কাছে অহী আসে এবং আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি তখন অল্প ছিলাম বিধায় তাঁদের কাছে যা শুনতাম তাই আগ্রহ সহকারে মুখস্ত করে নিতাম। কুরআনের অনেকাংশ এভাবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই আমি মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করে ফেলি। আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফত্‌হে মক্কার পর অষ্টম হিজরীতে যখন লোকজন ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় দলে দলে আসতে লাগল তখন পিতাও একদল লোক নিয়ে নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মদীনায় আসেন। রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কুরআন মাজীদ যে বেশী জানবে, তাঁকে ইমামতি করতে দেবে। ঘটনাক্রমে তখন আমিই সবচেয়ে বেশী কুরআন মজীদের অংশ মুখস্ত করেছিলাম বলে সর্বসম্মতিক্রমে আমাকেই ইমাম

নিযুক্ত করা হল। বড় জামাত বা জানাযার ইমামতি আমিই করতাম। অথচ
আমার বয়স তখন মাত্র ছয় বছর ছিল। -(বোখারী)

দ্বীনের প্রতি স্বভাবজাত আগ্রহের ছিল নমুনা এটাই যে, ইসলাম গ্রহণের
পূর্বেই কুরআনের অনেকগুলো আয়াত মুখস্থ করে ফেলা।

ক্রীতদাসের পায়ে বেড়ী

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেন, আমার মনিব হযরত
আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) আমাকে কুরআন হাদীস ও শরীয়তের আহকাম
শিক্ষার উদ্দেশ্য পায়ে বেড়ী দিয়েছিলেন, যাতে কোথাও আসা যাওয়া করতে না
পারি। এভাবেই তিনি আমাকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই
ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এরূপ অবস্থায়ই সম্ভব। না হয় যারা লেখাপড়ার সময়
বাজারে ও রাস্তায় ঘুরা ফেরা করে অথবা বিলাস ভ্রমণে যায়, তারা অযথা জীবন
নষ্ট করে। বেড়ীর কারণেই ক্রীতদাস ইকরামা, হযরত ইকরামা হতে
পেরেছিলেন। যাঁকে পরবর্তীতে হিবরুল উম্মত বা উম্মতের বিদ্যার সাগর
উপাধিতে ভূষিত করা হয়। হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, চারজন শ্রেষ্ট
তাবেয়ীর মধ্যে ছিলেন অন্যতম হযরত ইকরামা।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবাস (রাঃ) শৈশবে কুরআন হিফ্‌য

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) নিজেই বলেন, তোমরা আমার কাছে কুরআন
মজীদের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পার। কেননা, শৈশবেই আমি
কুরআন হিফয করে তাফসীর শাস্ত্র আয়ত্ব করেছি। এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে,
তিনি বলেন, আমি দশ বছর বয়সে কুরআন মজিদের শেষ মঞ্জিলের তাফসীর
আয়ত্ব করতে সামর্থ হই। তখনকার যুগের কোরআন পড়া বর্তমান যুগের পড়ার
মত ছিল না। তাঁরা যা পড়তেন, তাফসীর সহই পড়তেন। তাফসীর শাস্ত্রের
অধিকাংশ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)
সবচেয়ে বড় মুফাস্‌সিরে কুরআন ছিলেন।

হযরত আবু আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমাদের উস্তাদ সাহাবায়ে
কিরাম বলতেন, আমরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে দশটি করে আয়াত
শিখতাম তারপর অন্য দশ আয়াত এ সময় পর্যন্ত শিখতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত দশ
আয়াতের উপর আমল না হত। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় হযরত
আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) এর বয়স ছিল তের বছর। এ বয়সেই হাদীস ও
তাফসীর বিদ্যায় তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তা কিরামত ছাড়া আর কিছু

নয়। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর কাছে তাফসীর জিজ্ঞেস করতেন। অবশ্য রাসূল
(সাঃ)-এর একটি দোয়ার ফলশ্রুতিতে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে তিনি এরূপ
উচ্চমর্যাদা লাভ করেছিলেন। একবার রাসূল (সাঃ) ইস্তেঞ্জার জন্য বাইরে
গেলেন। ফিরে এসে দেখেন যে, পাত্র ভর্তি পানি রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানতে
পারলেন যে, এ খিদমতটুকু আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) করেছেন। এতে
সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁর জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তাঁকে কুরআনের
ইল্‌ম দান কর।

একবার রাসূল (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) পিছনে নিয়ত
করলেন। রাসূল (সাঃ) হাতে ধরে তাঁর বরাবর দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি
একটু পিছে হটে দাঁড়ালেন। নামাযের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,
তুমি এরূপ কেন করলে? তিনি আরয করলেন, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি কি
করে আপনার বরাবর দাঁড়াতে পারি? রাসূল (সাঃ) সন্তুষ্ট হয়ে দোয়া করলেন,
হে আল্লাহ্! তুমি তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ)-এর হাদীস হিফ্‌য

যেসব সাহাবায়ে কিরাম দৈনিক এক খতম কুরআন তিলওয়াত করতেন,
দিনে রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে মাশগুল থাকতেন হযরত
আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত
পরিশ্রম দেখে রাসূল (সাঃ) একদিন বললেন, এতে তোমার শরীর দুর্বল হয়ে
পড়বে, অধিক রাত্রি জাগরণে চোখে পানি আসবে, শরীরেরও হক রয়েছে
পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনেরও হক আছে। তিনি বলেন, আমি দৈনিক
এক খতম কুরআন পড়তাম জানতে পেরে রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, এক
মাসে এক খতম করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শক্তি ও
যৌবনকাল দ্বারা আমাকে উপকৃত হবার সুযোগ দিন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ
করলেন,আচ্ছা ঠিক আছে, বিশ দিনে এক খতম করবে। আমি আরয করলাম,
হায় রাসূলুল্লাহ! এত খুবই সামান্য। আমাকে আমার শক্তি ও যৌবন কাল থেকে
উপকৃত হবার সুযোগ দান করুন। এভাবেই আমি অনুরোধ করতে থাকি।
অবশেষে তিনি (সাঃ) আমাকে তিন দিনে এক খতম করার অনুমতি দেন।
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল, তিনি রাসূল (সাঃ)-এর
কাছ থেকে যা কিছু শুনতেন, তাই লিপিবদ্ধ করে করতেন, যাতে ভুলে না যান।
এমন কি লিখতে লিখতে একটি কিতাব তৈরী হয়ে যায়, যার নাম তিনি সাদেকা
রেখে দেন। তাঁকে নসীহত করেন, তুমি সব কথাই লিখে ফেল? অথচ রাসূল
(সাঃ) অনেক সময় রাগ করে অযথা হাসি-ঠাট্টা করেও কথা বলেন। কাজেই সব
কথা লেখা ঠিক নয়। এর পর তিনি লেখা ছেড়ে দিলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর কাছে যখন এ কথা প্রকাশ করা হল তখন তিনি বললেন, তুমি লিখতে থাক, ঐ আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন, রাগে হোক ধা খুশীতে হোক, এ মুখ থেকে হক কথা ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস (রাঃ) বড় আবেদ ও মুত্তাকী ছিলেন,। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী আমার চেয়ে বেশী রেওয়ায়েত করেননি। আমি লেখতাম না, তিনি লিখে রাখতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তাঁর রেওয়ায়েত বেশী। যদিও আমাদের যুগে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

হযরত যায়েদ (রাঃ) -এর কুরআন হিফ্য করা

অনেক বড় বুজুর্গ সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)। তিনি ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার মুফ্‌তী, এছাড়াও বিচার, ফারায়েয, ইলমে কিরাআত প্রভৃতি বিষয়ে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাহাবী। রাসূল (সাঃ)-এর হিযরতের সময় তাঁর বয়স মাত্র এগার বছর ছিল। অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুণ তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। রাসূল (সাঃ)-এর হিযরতের পাঁচ বছর পূর্বে মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি এতিম হয়ে যান। হিযরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় লোকজন দরবারে তাদের বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে এসে রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাযির হত। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমাকে যখন রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাযির করা হল, তখন লোকেরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করল এ ছেলেটি বনী নাজ্জার গোত্রীয়। আপনার মদীনায় আসার পূর্বেই সে সতেরটি সূরা মুখস্ত করেছে। রাসূল (সাঃ) পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পড়তে বললেন, আমি সূরা ক্বাফ পড়ে শুনালাম। রাসূল (সাঃ) আমার পড়া খুব পছন্দ করলেন। ইয়াহুদীদের কাছ থেকে যেসব চিঠি পত্র লেখা হত সেগুলো ইহুদীদের দ্বারাই লেখানো হত। কেননা তাদের ভাষা ছিল ইবরানী।

একবার রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, ইহুদীদের দ্বারা পত্র লেখানো আমার পছন্দ হচ্ছে না, তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখে নাও। মাত্র পনের দিনে তাদের ভাষা শিখে ফেললাম। তারপর থেকে ইবরানী ভাষায় যাবতীয় চিঠি আমিই লিখতাম এবং পড়তাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে সুরইয়ানী ভাষা তিনি মাত্র সতের দিনে শিখে ফেলেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-এর শৈশবে জ্ঞানচর্চা

তৃতীয় হিযরী রমযান মাসে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর জন্মগ্রহণ

করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। এ বয়সেই তিনি বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল হাওরা নামক এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সাঃ)-এর কোন কথা আপনার স্মরণে আছে কি? বলেন, হ্যাঁ আছে। আমি একদিন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে সদকার খেজুরের স্তুপ থেকে আমি খেয়ে ফেলি। রাসূল (সাঃ) কাখ্ কাখ্ বলে তা আমার মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন আমরা সদকার খেজুর খাই না। তিনি আরও বলেন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি বলেন, বিতরের নামাযে পড়ার জন্য রাসূল (সাঃ) আমাকে এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَ لَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ যাঁদেরকে আপনি সরল পথ দেখিয়েছেন তাঁদের মত আমাকেও সরল পথ দেখান, যাঁদেরকে সুস্থতা দান করেছেন তাঁদের মত আমাকে সুস্থতা দান করুন, আপনি যাঁদের অভিভাবক হয়েছেন আমাকেও তাঁদের মধ্যে শামিল করুন, আপনি আমাকে যা কিছু দান করেছেন তার মধ্যে বরকত দান করুন, ভাগ্যের পরিহাস থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে, আপনার উপর কারো কর্তৃত্ব চলে না, আপনি যাঁর বন্ধু, সে কখনও অপদস্ত হয়না। হে রব! আপনি বড় বরকতময় এবং বড় মর্যাদাশীল।" হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফযরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসে থাকে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে নাযাত পাবে। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) পায়ে হেটে কয়েকবার হজ্ব করেছেন। তিনি বলতেন, আমার লজ্জা হয় যে, কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌কে কি করে মুখ দেখাব? যদি পায়ে হেঁটে তাঁর ঘরের দিকে না যাই। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং পরহেযগার ছিলেন। তিনি তেরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে

মুহাদ্দিসীনগণের অভিমত। সাত বছর বয়সে হাদীস মুখস্থ করা এবং বর্ণনা করা কি সাধারণ ব্যাপার? অথচ আমরা সাত বছর বয়সে দ্বীনের সামান্য জ্ঞানও শিখতে সক্ষম হইনি।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর জ্ঞানচর্চা

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) থেকে এক বছরের ছোট ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর কয়েক মাস। এ বাচ্চা কতটুকু দ্বীন শিখতে পারে? তবুও তিনি আটটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। মুহাদ্দিসীনগণ তাঁকে এসব বর্ণনাকারীদের অন্তরভুক্ত করেছেন যাঁরা আটটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যাক্তি মুসিবতগ্রস্থ হবার অনেক দিন পরেও তা স্মরণ আসলে যদি إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাহলে সে প্রথম বার মুসিবতগ্রস্থ হবার ন্যায় নেকী পাবে। তিনি আরও বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জলপথে ভ্রমণ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - এ দোয়া পড়বে সে পানিতে ডোবা থেকে নিরাপদ থাকবে। হযরত হোসাইন (রাঃ) ২৫ বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন।

মোট কথা দ্বীনের প্রতিটি কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অধিক পরিমাণে করতেন। হযরত রাবীয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সাঃ)-এর কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি একবার একটি জানালার উপর রাখা কিছু খেজুর থেকে একটি মুখে দিয়ে ফেলি। রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, ওটা ফেলে দাও। আমাদের জন্য সদকা জায়েয নয়। হযরত হোসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানের অভ্যাস হল, অযথা সময় নষ্ট না করা।

এ ধরনের শিশুকালের অসংখ্য ঘটনাবলী সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন। হযরত মাহমুদ ইব্‌নে রাবী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছিল। আমি জীবনভর এ কথা ভুলব না যে, একদিন রাসূল (সাঃ) আমাদের বাড়ী এসে কুয়া থেকে পানি পান করলেন এবং একটি কুলি আমার মুখে করলেন। আমরা আজে বাজে সত্য

মিথ্যা কিছু কাহিনী শুনিয়ে আমাদের বাচ্চাদের নষ্ট করে থাকি। ভুত, পেতনীর ভয় না দেখিয়ে আল্লাহ্, আযাবের ভয় দেখানো উচিত।

শিশুদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহ্ ওয়ালাদের কিচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী করা উচিত। তবেই তো তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগত হবে। এতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উপকৃত হবে। শিশুকালে স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে থাকে। এ সময় শিশুকে যা শিখানো হয়, তা সে কখনো ভুলে না। শিশুকালে বাচ্চাদেরকে কুরআন হিফয করানো খুবই সহজ, মুখস্তও দ্রুত হয়, সময়ও কম লাগে, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্‌ধলবী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা মায়ের দুধ ছাড়ানোর পূর্বেই এক পারা চতুর্থাংশ হিফয করে ছিলেন। তিনি সাত বছর বয়সে পুরা কুরআনের হাফেয হন। আমার দাদা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, দৈনিক এক খতম কুরআন পড়ে নিবে তারপর সারাদিন ছুটি। এ সাত বছর বয়সেই তিনি হিফযের ফাঁকে ফাঁকে ফার্সীর পহেলী থেকে নিয়ে বুস্তাঁ, সেকান্দর নামা এসব জটিল জটিল কিতাবের বেশির ভাগ তিনি এ সময়ের মধ্যেই পড়েছেন। তিনি বলেন, গরম মৌসুমে ফযরের নামাযের পর আমি ঘরের ছাদে বসে ছয় সাত ঘন্টায় কুরআন মজীদ পুরা এক খতম করে দুপুরের খানা খেতাম। বিকালে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফার্সী কিতাব সমূহ পড়তাম। ছয় মাস পর্যন্ত আমার এ অভ্যাস নিয়মিত চলতে থাকে। ছয় মাস পর্যন্ত দৈনিক এক খতম করা, সাথে সাথে অন্যান্য কিতাব পড়া কি চাট্টিখানি কথা? এ দূরহ কাজটি তিনি সম্পাদন করেছেন মাত্র সাত বছর বয়সে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নবী প্রেমের কয়েকটি অপূর্ব কাহিনী

সাহাবায়ে কিরামের এ যাবত যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সব কটি ঘটনাই ছিল মহব্বতের নিদর্শন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসার সংস্পর্শেই তাঁরা জান-মালের, মান-ইজ্জতের, ধন-সম্পদের, দুঃখ-দৈন্যের পরওয়া না করে অসাধ্য সাধন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহব্বত কোন দেখার বস্তু নয়। মহব্বত হল ভাষার উর্দ্ধে একটি অনুভূতির নাম। যখন অন্তরে সে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠে, প্রাণপ্রিয় মাহবুবের মোকাবিলায় তার মান-ইজ্জত, লজ্জা-শরম সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। মেহেরবান পরওয়ারদেগার প্রিয় মাহবুব নবীর উসিলায় আমাদের অন্তরে যদি মহব্বত দান করে দেন, তবে যে কোন ইবাদতের মধ্যে স্বাদ পাওয়া যাবে। দ্বীনের প্রয়োজনে যে কোন মুসিবতই শান্তির মনে হবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক ইসলামের প্রথম ভাষণ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেহ ইসলাম গ্রহণ করলে যথাসম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করত। কাফেরদের নির্যাতনের ভয়ে স্বয়ং রাসূল (সাঃ)ও গোপন রাখার ব্যাপারে নও মুসলিমদের উৎসাহ দান করতেন। যখন মুসলমানদের সংখ্যা উন্নতি হয়ে উনচল্লিশে দাঁড়ায়, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি চাইলে, প্রথমে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর বারংবার অনুরোধে সম্মত হন। তিনি নব দীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে কা'বা ঘরে উপস্থিত হয়ে খুত্বা দিলেন। এটাই ইসলামের প্রথম ভাষণ । সে দিনই রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হযরত হাম্যাহ্ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার মাত্র তিন দিন পর হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খোত্বা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই চারদিক থেকে কাফেররা মুসলমানদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন ও নিপিড়ন শুরু করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) যথেষ্ট প্রভাবশালী ও বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তাঁকে এমন মারধর করে যে, তাঁর চেহারা, রক্তাক্ত এবং ভীবৎস হয়ে যায়। তাঁকে দেখে চেনার কোন উপায়ই ছিল না। জালেমদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে তিনি বেহুস হয়ে যান। এ মর্মান্তিক খবর শুনে বনী তাইমের লোকজন তাঁকে নিয়ে যায়। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, তিনি আর

বাঁচবেন না। হারাম শরীফে দাঁড়িয়ে বনী তাইমের বীর পুরুষরা ঘোষণা করল যে, এ দুর্ঘটনায় যদি আবু বকর (রাঃ) মারা যায়, তাহলে আমরা প্রতিশোধে ওতবা ইব্নে রাবীয়াকে হত্যা করব, কারণ তার ভূমিকা ছিল আবু বকর (রাঃ)-কে মারধরের ব্যাপারে অধিক।

হযরত আবু বকর (রাঃ) সন্ধ্যা পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় থাকার পর যখন হুশ ফিরে এল, তখন প্রথম কথাই ছিল যে, আমার রাসূল (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? বনী তাইমের উপস্থিত লোকজন এ কথা শুনে তাঁকে নানান কথা বলতে লাগল যে, যার কারণে তোমার এ করুণ অবস্থা, আবারও তারই নাম। তারা তাঁর মাতা উম্মুল খায়ের (রাঃ)-কে বলে গেল যে, তাঁর জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে। তাঁর মাতা কিছু খানা তৈরী করে তাঁকে খেতে বলল। একই কথা যে, আমার রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থা কি? তিনি নিরাপদে কি আছেন? তাঁর মাতা বললেন, আমার তো জানা নেই তিনি কেমন আছেন? মাতাকে বললেন ওমরের বোন উম্মে জামীলের কাছে জিজ্ঞেস করতে, তিনি ছেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে উম্মে জামীলের কাছে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থা জিজ্ঞেস করলে উম্মে জামীল (রাঃ) সাধারণ নিয়মানুসারে নিজের ইসলামকে কঠোরভাবে গোপন রেখে বললেন, অনুমতি হলে তাঁকে দেখে আসতে পারি। উম্মে খায়ের তাঁকে সাথে নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এলেন। উম্মে জামিল তাঁর এ অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। জালিমরা তাঁকে কিভাবে অত্যাচার করেছে? আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দান করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বল! আমার রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থা কি? তিনি কেমন আছেন? উম্মে জামিল তাঁর মার দিকে ইশারা করে বললেন, তার বিষয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ) ভাল আছেন। হযরত আরকামের ঘরে আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম আমি ঐ পর্যন্ত কিছুই খাবনা এবং পান করবনা যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দর্শন না করব। হযরত আবু বকরের কসম শুনে তাঁর মাতা আরও অস্থির হয়ে পড়লেন। কেননা, রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কিছুই খাবেন না। বাধ্য হয়ে তিনি এর ব্যবস্থা করলেন এবং কোন দুশমন দেখে ফেলে কিনা এ ভয়ে রাত গভীর হওয়ার অপেক্ষা করলেন। রাতে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নিয়ে হযরত আরকামের ঘরে পৌছলেন। হযরত আবু বকর রাসূল (সাঃ)-কে দেখা মাত্র তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আর রাসূল (সাঃ) ও তাঁকে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং সমস্ত মুসলমানও কাঁদতে লাগলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উম্মে খায়েরের দিকে

ইশারা করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার মা। তাঁর হিদায়েতের জন্য দোয়া করে ইসলামের দাওয়াত দিন। রাসূল (সাঃ) দোয়া করে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিলেন, তিনি সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অস্থিরতা

হযরত ওমর (রাঃ)-এর বীরত্ব; শক্তি ও নির্ভীকতা প্রবাদ বাক্যরূপে বিদ্যমান। আজ চৌদ্দ শত বছর পরেও তাঁর সে- কীর্তি বিশ্বময় প্রশংসিত। তিনিই সর্ব প্রথম মুসলমান, যিনি নিজের ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন।এত বড় বীরপুরুষ হয়েও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালে আত্মভোলা হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয়ে যান। রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে জ্ঞান হারা অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, আমার রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়েছে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। রাসূল (সাঃ) তো স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। অচিরেই তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। আমি তাদের হাত পা কেটে দিব যারা রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের খবর ছড়িয়েছে। হযরত ওসমান (রাঃ) বাকশক্তি হারিয়ে একেবারে নিঃচুপ হয়ে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে শব্দ বের হচ্ছিল না। মৃত্যুশোকে হযরত আলী (রাঃ) নড়াচড়া করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন। একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ) পাহাড়সম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অসাধারণ মহব্বত থাকা সত্বেও তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে রাসূল (সাঃ)-এর কপালে চুমু খেলেন। অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) কে বললেন, হে ওমর ! বসে পড়। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে একটি খোতবা দিয়ে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ভালবাসে, সে যেন জেনে নেয় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর যাঁরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি, সে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব ও অমর । অতঃপর তিনি এ আয়াতে তিলাওয়াত করলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -

" মুহাম্মদ (সাঃ) কেবলমাত্র একজন রাসূল ছিলেন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। "অতএব, তিনি যদি মারা যান অথবা শহীদ হন, তাহলে কি তোমরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে? হ্যাঁ, তোমরা যদি ইসলাম থেকে ফিরে যাও, তাতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ

হবে। আর যারা হকের উপর অটল থাকবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। যেহেতু আল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাধ্যমে খিলাফতের কাজ সমাধা করবেন, তাই তাঁকে সময়োপযোগী ধৈর্য, সহ্য ও জ্ঞান দান করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-কে কোথায় দাফন করা হবে- মদীনায়, নাকি মক্কায়, না বায়তুল মুকাদ্দাসে? এ নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে- তিনি ফয়সালা দিলেন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, 'কোন নবী যেখানে ইন্তিকাল করেন সেখানেই তাঁর কবর হয়।' এভাবে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাঁর মাধ্যমে এবং তা সকলে মেনে নেন। তিনি ওয়ারিশী সম্পত্তির সমস্যার সমাধান এভাবে করলেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নবীদের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি সদকা হিসাবে গণ্য হয়। তিনি খিলাফতের সমস্যার সমাধান করেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, খিলাফতের হক্বদার একমাত্র কোরায়েশ বংশের লোক। রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে বে- পরওয়া হয়ে কাউকে আমীর মনোনীত করে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

রাসূল প্রেমিক এক স্ত্রীলোকের অস্থিরতা

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ে অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন মেয়েলোকেরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের রাসূল (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? এ মুহূর্তে কেহ তাঁকে খবর দিল যে, তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়লেন এবং অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার রাসূল (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? তখন কেহ বলে উঠল, তোমার স্বামী শহীদ হয়েছেন। তিনি এবারও ইন্নালিল্লাহ পড়লেন এবং প্রচন্ড অস্থির অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বল, আমার রাসূল (সাঃ) কেমন আছেন? এভাবে কেহ তাঁকে বলল, তোমার ছেলে শহীদ হয়েছে। একজন এসে বলল, তোমার ভাই শহীদ হয়েছে । তিনি প্রতিবারই ইন্নালিল্লাহ পড়েছিলেন আর অস্থিরতার সাথে রাসূল (সাঃ)-এর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। অবশেষে লোকেরা তাঁকে বলল, রাসূল (সাঃ) ভাল আছেন এবং মদীনায় আসছেন। তিনি বললেন, আমি আমার মনকে বুঝ দিতে পারছি না ঃ তোমরা বল, রাসূল (সাঃ) এখন কোথায় আছেন? লোকেরা ইশারা করে বলল, রাসূল (সাঃ) ঐ দলে আছেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে এক বার দেখে চক্ষুকে শীতল করে

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দর্শন লাভের পর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত আমার কাছে অতি তুচ্ছ হয়েছে। আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক । হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি জীবিত আছেন। তাই পিতা, স্বামী ,পুত্র ও ভাইয়ের শহীদ হয়ে যাওয়াতে আমার কোন দুঃখ নেই। আপনিই আমার পরম শান্তনা।

রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহাবী কবি

কাআব ইবনে যুহাইর মুযানী ছিলেন জাহলি যুগের বিখ্যাত কবিদের একজন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে 'আশহারুশ শোয়ারায়িল আরব' তথা আরবের সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতিমান কবি বলে অভিহিত করতেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁর ভাই বুজাইর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে কাআব অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ওঠেন। বুজাইর বাধ্য হয়ে হিযরত করে চলে যান। এতে কাআব রাসূল (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক কবিতা লিখে লিখে মদীনাগামী লোকদের হাতে নিজের ভাই বুজাইরের কাছে পাঠাতে থাকে। তিনি এসব কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর অবহিত করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বলেনঃ "কাআবকে দেখা মাত্র হত্যা করবে।" তারপর থেকে কাআব মক্কায় গিয়ে নিয়মিতভাবে কোরায়েশদের সাথে মিলে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

তায়েফ অভিযান থেকে রাসূল (সাঃ)-এর মদীনা ফেরার পর কাআবের ভাই বুজাইর ক্বাবকে চিঠি লিখে জানান যে, রাসূল (সাঃ) কঠিন থেকে কঠিনতর বিরোধী ও বিদ্বেষীকেও ক্ষমা করে দেন! তুমিও এসে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ শোনার পর ক্রমাগত বিরোধী গেত্রের কাছে কাআব আশ্রয় লাভের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু সবাই যখন তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে, তখন ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে । তাঁর রাসূলের দরবারে পৌঁছার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনা রয়েছে। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর খিদমতে তার বিখ্যাত স্তুতি পাঠ করে শুনান। এতে ৫৮টি পংক্তি ছিল।

এ কবিতা পঙক্তিগুলো শোনার সাথে সাথে হযরত (সাঃ) অথৈ সাগর উথলে উঠে। তিনি নিজের চাদরখানা কাঁধ থেকে খুলে যুহাইরের মাথায় দিয়ে দেন। যে লোকটি আজীবন রাসূল (সাঃ) অপচর্চায় মেতে থাকত সে আজ রাসূল (সাঃ) চাদর মোবারকের কোমল স্পর্শে বিনায়াবনত হয়ে পড়ল। রাসূল (সাঃ) এর দরবার থেকে কোন কবির পুরস্কারপ্রাপ্তির এটাই সর্বপ্রথম ঘটনা। বস্তুতঃ

এটি সে পবিত্র চাদর যেটি আমীর মুয়াবিয়া তাঁর খিলাফত আমলে যুহাইরের কাছ থেকে দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে কিনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুহাইর এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, "রাসূল (সাঃ)-এর দেয়া পবিত্র চাদর খানা অন্য কাউকে দিয়ে আমি তাকে নিজের উপর গুরুত্ব দিয়ে পারি না।"

অবশ্য আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যুহাইর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর এ চাদরটি তার পরিবারের কাছ থেকে থেকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলেন। পরবর্তী উমাইয়া খলীফাগণ এ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করতেন। উল্লেখ্য যুহাইরের আলোচ্য স্তুতি কাব্যে প্রভাবিত হয়েই পরবর্তীকালে আবু আবদুল্লাহ্ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ বুসাইরীও ৬০৮-৬৯৩ হিজরী) কাসীদায়ে নামে ১৬২ পঙক্তিবিশিষ্ট একখানা কাসীদা রচনা করেন। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। কাসীদাটি রচনার পর তিনি স্বপ্নযোগে রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে পেশ করলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে নিজের চাদর উপহার দেন এবং তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে দেন। এতে সুস্থ হয়ে যান।

হযরত কাআব (রাঃ) ইবনে যাহাইরকে দেয়া রাসূল (সাঃ) যে চাদরটি নাকি আজো তুরস্কে সংরক্ষিত আছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও সাহাবীদের মনোভাব

ষষ্ঠ হিজরী সনে যিলকদ মাসে প্রসিদ্ধ হুদায়বিয়ার সংঘটিত হয়। প্রায় চৌদ্দ শত সাহাবী নিয়ে রাসূল (সাঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমাহ রওয়ানা হন। মক্কার কাফেররা খবর পেয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করল। তারা মক্কার আশে পাশে আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আহবান করল। এদিকে রাসূল (সাঃ) যুল- হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে এক ব্যক্তিকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মক্কায় পাঠালেন। লোকটি পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আসফান নামক স্থানে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তথ্য দিল যে, মক্কায় কাফেররা এক শক্তিশালী দল গঠন করছে এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রসমুহকেও তাদের সাহাযার্থে ডেকে পাঠিয়েছে। সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন রাসূল (সাঃ) এ পরিস্থিতিতে কি করা যায়? রাসূল (সাঃ) নিজেই বললেন, একটা কাজ এমন করা যেতে পারে যে, আমরা বাইরে থেকে সাহায্যকারীদের ঘর বাড়ি আক্রমণ করতে পারি। যখন তারা এ খবর শুনবে তখন তারা মক্কা অভিমুখ থেকে ফিরে চলে আসবে । অথবা কোথাও আক্রমণ না করে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! (সাঃ) এখন আপনি বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারতে এসেছেন। যুদ্ধের কোন ইচ্ছা আদৌ নেই। এতে যদি বাধা প্রদান করে আমরা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। রাসূল (সাঃ) এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে হোদায়াবিয়া নামক স্থানে পৌছলেন। তখন বোদায়েল ইব্‌নে ওরাকা একদল লোকসহ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনাকে মক্কাবাসীরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবেনা। তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমরা তো যুদ্ধের জন্য আসিনি, উদ্দেশ্য হল শুধু ওমরা করা। তিনি আরও বললেন, লাগাতার যুদ্ধ বিগ্রহে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তাঁরা সম্মত হলে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত। যেন আমরা পরস্পর আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ না করি । তারা যদি এতে সম্মত না হয়, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যার কুদরতী হাতে আমার জান, আমি ঐ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম জয়যুক্ত না হবে অথবা আমার গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হবে। বোদায়েল বলল, আপনার প্রস্তাব তাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি,। সুতরাং সে মক্কার কাফেরদের কাছে রাসূল (সাঃ) এর প্রস্তাব পৌছালে এতে তারা কোন কর্ণপাত করল না।

এভাবে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা চলাশেষে ওরওয়া ইব্‌নে মাসউদ সাকাফী কাফেরদের প্রতিনিধি হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি চান যে, সমস্ত আরববাসীকে ধ্বংস করে দিবেন, তা কখনও সম্ভব নয়। কেননা, এরূপ কোন নজীর ইতিহাসে নেই যে, কেহ তাদেরকে ধ্বংস করতে পেরেছে। আর যদি তারা আপনার উপর জয়ী হয়, তাহলে আপনার রক্ষা নেই। কেননা, আপনার চারদিকে নীচু শ্রেণীর লোকজন দেখতে পাচ্ছি। বিপদের সময় তারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এ কথা শুনা মাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন। হে দুর্ভাগা, কি করে ধারণা করলি যে , আমরা রসূল (সাঃ)-কে একাকী ছেড়ে পালিয়ে যাব?

ওরয়াহ্ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, আবু বকর (রাঃ)। ওরয়াহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, তোমার বহু দিনের একটা এহ্‌সান আমার কাঁছে রয়েছে, যার প্রতিদান আমি এখনও দিতে পারিনি, নচেত আমি তোমার কথার সমুচিত জবাব দিতাম। অতঃপর সে পুনরায় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হল। আরবের দস্তুর মোতাবেক সে কথায় কথায় রাসূল (সাঃ)-এর দাড়ি মোবারকের দিকে হাত প্রসারিত

করত।এ দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে সহ্য করতেন? তাই স্বয়ং তারই ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মুগীরা ইব্‌নে শোবা (রাঃ) লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাশেই দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি তরবারীর খাপ ওরওয়ার হাতে মেরে বলে উঠল, বে- আদব, হাত সরিয়ে রাখ। ওরওয়াহ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, মুগীরা ইব্‌নে শোবা।

স্বীয় ভাতিজার পরিচয় পেয়ে ওরওয়া বলল, তোর গাদ্দারীর পরিণতি আমি এখনও ভুগছি, আর তোর এরূপ ব্যবহার? হযরত মুগীরা (রাঃ) ওরওয়ার ভাতিজা ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। ওরওয়া সে হত্যার জরিমানা তখনও আদায় করছিল। একথার সে দিকেই ইঙ্গিত ছিল। অতঃপর সে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হল। মোটকথা সে দীর্ঘক্ষণ (সাঃ) রাসূল (সাঃ) -এর সাথে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সাহাবায়ে কিরামের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরিশেষে মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে সে এরূপ তথ্য দেয় যে, হে কোরায়েশগণ ! আমি কায়সার ও কিসরা এবং নাজ্জাশীর শাহী দরবারে গিয়েছি। আমি দুনিয়ার কোন বাদশাহ্‌কে এত শ্রদ্ধা তার সভাসদকে করতে দেখিনি, যত শ্রদ্ধা মুহাম্মদকে তাঁর সাহাবারা করেন। মুহাম্মদ থুথু ফেললে যাঁর হাতে পড়ে সে তা মুখে ও শরীরে মেখে নেয়। তাঁর আদেশ পাওয়া মাত্র সাথে সাথে তা পালন করার জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর অযূর পানি নিয়ে পরস্পরে কাড়া কাড়ি লেগে যায়। তাঁর অযূর পানি মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁরা হাতে, গায়ে মালিশ করে নেয়। কেহ এক বিন্দুও না পেলে, অন্যের ভিজা হাত নিজের মুখে মালিশ করে। তাঁরা মুহাম্মদের সামনে খুব নীচু স্বরে কথা বলেন। শ্রদ্ধায় কেহ তাঁর দিকে মাথা উচুঁ করে তাকায় না। তাঁর মাথার অথবা দাঁড়ির কোন চুল পড়লে শ্রদ্ধার সাথে তা উঠিয়ে রাখে।

মোটকথা, মনিবের এত শ্রদ্ধা করতে আমি আর কোথাও দেখিনি। ইত্যবসরে, রাসূল (সাঃ)-এর দূত হিসাবে হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কার নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য সেথায় পৌছলেন । মুসলমান হলেও মক্কাবাসীদের অন্তরে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ছিল। এ জন্যে তাঁর ব্যাপারে তেমন ভয়ের কোন কারণ ছিলনা। তাঁকে মক্কায় পাঠানোর পর সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগলেন, ওসমান কাবা শরীফে তাওয়াফ করবে আর আমরা রয়ে গেলাম।

তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার তো মনে হয় না, ওসমান আমাকে ছেড়ে তাওয়াফ করবে। মক্কায় আবান ইব্‌নে সাঈদ হযরত ওসমান (রাঃ)-কে আশ্রয় দিয়ে বলল, আপনি যেথায় ইচ্ছা যেতে পারেন ; কেহ আপনাকে বাধা

দিবে না। তিনি সেখানে আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর প্রস্তাব পৌঁছে দিলেন। মক্কা থেকে ফেরার পথে কাফেররাই বলল, আপনি কাবা ঘর তাওয়াফ করে যান। তিনি বললেন, তা কখনও হতে পারে না যে, রাসূল (সাঃ) বাধাগ্রস্থ থাকবেন আর আমি তাওয়াফ করব। এতে কোরাইশগণ ক্ষুব্ধ হয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে বন্দী করলে মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে। এ সংবাদে রাসূল (সাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য বায়আত গ্রহণ করলেন। সমস্ত সাহাবী (রাঃ)-গণ মরণপণ যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। এ বায়আতকেই বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়। অর্থাৎ- স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার। মুসলমানদের এরূপ দৃঢ়সংকল্পের সংবাদ শুনে মক্কার কাফেররা ঘাবড়ে গিয়ে হযরত ওসমান (রাঃ) কে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ওরওয়াকে গালি দেয়া, মুগীরার আঘাত, সাহাবাদের রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাধারণ ব্যবহার সম্পর্কীয় ওরওয়ার তথ্য, ওসমান (রাঃ)-এর তওয়াফ থেকে অস্বীকৃতি প্রভৃতি ঘটনাবলী রাসূল (সাঃ) সাথে সাহাবাদের পরম ভালবাসারই নিদর্শন।

হযরত ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর রক্ত পান

রাসূল (সাঃ) একবার সিঙ্গা লাগিয়ে দেহ মোবারক থেকে কিছু রক্ত বের করলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)-কে বললেন, এ রক্তগুলো কোথাও পুঁতে রাখ। তিনি এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! পুঁতে রেখেছি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়? তিনি বললেন, আমি সেগুলো পান করে ফেলেছি। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যে শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করেছে, তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর রক্ত পান

ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর মাথায় যখন দু'টি লোহার কড়া ঢুকে গিয়েছিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) দৌঁড়ে আসলেন, অন্য দিক থেকে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)ও দৌঁড়ে এসে রাসূল (সাঃ)-এর মাথা থেকে দাঁত দ্বারা লোহার কড়া খুলতে লাগলেন। লোহার কড়া বের করলেন কিন্তু তাতে তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তিনি এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্বিতীয় কড়াটিও খুলতে লাগলেন। দ্বিতীয় কড়াটিও বের হয়ে আসল কিন্তু তাঁর আরও একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। কড়া খোলার ফলে রাসূল (সাঃ)-এর শরীর মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা রক্তগুলো

চুষে ফেললেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যে শরীরে আমার রক্ত ঢুকেছে তাঁকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) কর্তৃক পিতাকে অস্বীকৃতি

জাহেলিয়াতের যুগে হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেস (রাঃ) মাতার সাথে নানার বাড়ী যাচ্ছিলেন। রাস্তায় বনী কায়েস তাদের কাফেলাকে লুট করে, যার মধ্যে যায়েদ (রাঃ)ও ছিলেন। বনী কায়েস হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে মক্কায় এনে বিক্রি করে দেয়। হাকিম ইব্‌নে হেযাম আপন ফুফু হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর জন্য যায়েদ (রাঃ)-কে খরিদ করেন।

রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহের পর তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে হাদীয়া স্বরূপ রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করেন। এদিকে যায়েদ (রাঃ)-কে হারিয়ে তার পিতা বিচ্ছেদের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে এবং কেঁদে কেঁদে কবিতা পড়তে থাকেন। যার অর্থ এরূপ– 'আমি যায়েদের বিরহে কাঁদছি, আমি এটাও জানিনা যে, যায়েদ জীবিত না মৃত। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কথাও জানিনা যে, যায়েদকে নরম জমীন ধ্বংস করল, না পাহাড়। আফ্‌সোস! আমি যদি জানতে পারতাম, তুমি আবার ফিরে আসবে কি না! তোমার ফিরে আসাটাই আমার জীবনে শেষ আশা। যখন সূর্য উঠে তখন যায়েদই আমার মনে উঁকি মারে। আর বাতাস যখন একটু বেগে চলে তখনও যায়েদ এসে আমার মনে ব্যথা দেয়।' হায়! আমার দুশ্চিন্তা ও ফিকির কত দীর্ঘ? আমি তার তালাশে দ্রুতগামী উটকে কাজে লাগাব। উট যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমি কখনও ক্লান্ত হব না। হায়! যদি আমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আমার সব আশাকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আমি আমার আত্মীয়কে অসিয়ত করে যাব। তারাও যেন আমার কলিজার টুকরা প্রিয় যায়েদকে এ ভাবেই তালাশ করা অব্যাহত রাখে। এভাবে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা কবিতা পড়ে পড়ে অশ্রু জলে ভাসত আর যায়েদ (রাঃ)-কে তালাশ করত। ঘটনাক্রমে তার গোত্রের কিছু লোক মক্কায় হজ্ব করতে এসে যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তাঁরা হযরত যায়েদ (রাঃ) কে চিনে ফেলে। তাঁর পিতার দুরাবস্থার কথা বলল এবং কয়েকটি কবিতা আবৃতি করে শুনাল। হযরত যায়েদ (রাঃ) পিতার কাছে তিনটি লাইন কবিতাকারে লিখে তাঁদের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। যার অর্থ হল– 'আমি এখানে মক্কা নগরীতে বড়ই সুখে-শান্তিতে রয়েছি। আপনি কোন দুশ্চিন্তা করলেন না। আমি এখানে অত্যন্ত শরীফ লোকের ক্রীতদাস হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে।'

তারা গিয়ে পিতার কাছে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর খবর দিল এবং তাঁর ঠিকানাও বলে দিল। সংবাদ শুনে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা ও চাচা তাঁকে গোলামী থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা-কড়ি নিয়ে মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হল। মক্কায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল; 'হে হাসেমের আওলাদ ! আপনারা স্বীয় কওমের সর্দার, হারাম শরীফের অধিবাসী, আল্লাহ্র ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা স্বয়ং কয়েদীকে মুক্তিদান করেন আর ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে থাকেন। আমরা আপন সন্তানের তালাশে আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের উপর অনুগ্রহ করে বিনিময় গ্রহণ করুণ।' তাকে মুক্তি দিন, বিনিময়ে ফিদিয়ার চেয়ে অধিক গ্রহণ করুন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি পরিস্কার করে বল। তারা বলল, আমরা যায়েদের খোঁজে এসেছি। তারা বলল, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাসূল (সাঃ) বললেন, জিজ্ঞেস কর । সে যদি তোমাদের সাথে যায়, তাহলে নিয়ে যাও, কোন বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। আর যদি সে স্বেচ্ছায় যেতে না চায়, তাহলে আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারিনা।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার পিতার সাথে চলে যেতে পার। আর ইচ্ছা করলে, তুমি আমার কাছে থেকে যেতে পার। হযরত যায়েদ (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না। পিতার ও চাচার স্থলে আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট । এ কথা শুনে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা ও চাচা বললেন, যায়েদ! তুমি কি আযাদ হওয়ার স্থলে গোলাম হওয়াটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছ? আর পরিবার পরিজনের সাথে স্বাধীনভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার স্থলে ক্রীতদাস হওয়াটা কি পছন্দ করছ? যায়েদ (রাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! আমি রাসূল (সাঃ)-এর মাঝে এমন জিনিস দেখেছি, যার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিসকেই আর পছন্দ করতে পারছি না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, যায়েদ, আজ থেকে তোমাকে আমার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলাম। এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে যায়েদ (রাঃ) এর পিতা ও চাচা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রেখেই চলে গেল। হযরত যায়েদ (রাঃ) তখন অল্প বয়স্ক কিশোর ছিলেন। এমন বয়সে পিতা মাতা ও সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে বিসর্জন দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর গোলামী করা কতটুকু মহব্বতের পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত আনাস ইব্নে নযর (রাঃ)-এর শাহাদত

চরমভাবে ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূল (সাঃ) শহীদ হয়েছেন। এ ভয়াবহ খবরে সাহাবীদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য । এতে সমস্ত সাহাবী (রাঃ) নিরাশ হয়ে গেল। হযরত আনাস ইব্নে নযর (রাঃ) যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি মোহাজির ও আনসারদের একটি জামায়াতকে দেখলেন, যার মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি সবাইকে অস্থির অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সবাইকে অস্থির দেখা যাচ্ছে। তাঁরা উত্তর দিলেন, রাসূল (সাঃ) শহীদ হয়েছেন। এ কথা শুনে আনাস (রাঃ) বললেন, তাহলে তো আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। এ বলে তরবারী হাতে নিয়ে কাফেরদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবীর দর্শনের জন্যই জীবিত আছি, তাঁর অবর্তমানে এ জীবন থেকে আর কি হবে? তাই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করলেন না।

ওহুদের ময়দানে সা'আদ ইব্নে রাবী (রাঃ)-এর পয়গাম

ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) বললেন, না জানি সা'আদ ইব্নে বারীর কি অবস্থা হল? এ বলে তিনি একজন সাহাবীকে তাঁর তালাশে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আহতদের মধ্যে নাম ধরে ডেকে ডেকে তালাশ করতে লাগলেন । হঠাৎ এক স্থান থেকে খুব ক্ষীণ উত্তর শুনা গেল। তিনি সেখানে খুব দ্রুত গিয়ে দেখলেন যে, সাতজন শহীদের মধ্যে তিনি কাতরাচ্ছেন, মাত্র দু'একটি নিঃশ্বাস বাকী আছে। সাহাবীকে দেখা মাত্রই হযরত সা'আদ (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) কে আমার সালাম পেশ করবে আর বলবে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন যা কোন নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করেছেন। আর মুসলমানদেরকে আমার এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দিবে যে, তোমাদের মধ্যে একজন মানুষও জীবিত থাকতে যদি কোন কাফের রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন ওযর আপত্তি চলবে না। এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাস্তবিকই এসব মহাপুরুষগণই নবী প্রেমের পরিপূর্ণ হক আদায় করে গেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের কবরকে নূর দ্বারা আলোকিত করে দিন।

ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে উপনীত, তবুও নিজের জন্য নেই কোন অভিযোগ। নেই কোন অস্থিরতা, আছে শুধু প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়নবী (সাঃ)-এর হিফাযতের চিন্তা। তাঁর জন্য জান কোরবান করার ফিকির। হায়! আল্লাহ্ যদি আমাদের মত অধমকেও তাঁদের মত মহব্বতের সামান্যতম অংশ দান করতেন।

রাসূল (সাঃ)-এর কবর দেখে এক রমণীর মৃত্যু

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে একজন মেয়ে লোক এসে আরয করল, আমাকে রাসূল (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত করিয়ে দিন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হুজরা মোবারক খুলে দিলেন। মেয়েলোকটি কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে কেঁদে কেঁদে সেখানেই তার ইন্তিকাল হল। মহব্বতের এমন নজীর কি কোথাও পাওয়া যাবে? কবর যিয়ারত করে রাসূল (সাঃ)-এর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারলেন না, আর সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন।

সাহাবী (রাঃ)-দের নবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী

হযরত আলী (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞেস করল, রাসূল (সাঃ) এর সাথে আপনার কতটুকু মহব্বত ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে নিজেদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও ভীষণ পিপাসার সময় ঠান্ডা পানি থেকেও অধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি সত্যই বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই কামেল মুমিন অর্থাৎ পরিপূর্ণ মো'মিন ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ারা ইরশাদ করেন—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ـ

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলেদিন, তোমাদের পিতা, তোমাদের

পুত্র, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের পরিবার পরিজন আর যে ধন সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ আর যে সব ব্যবসায় তোমাদের ঘাটতির আশংকা নেই আর যেসব ঘর বাড়ী তোমরা পছন্দ কর এসব বস্তু যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা সে সময়ের অপেক্ষা কর, যখন আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংসের হুকুম নাযিল করবেন। মনে রাখবে, আল্লাহ্ তায়া'লা আদেশ অমান্যকারীদের সুপথ দেখান না। এ আয়াতে এসব বস্তু থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত কম হওয়ার উপর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি প্রকৃত মো'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মহব্বত তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত লোক থেকে বেশী না হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ওলামাগণ এ হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে মহব্বত দ্বারা ইখতিয়ার ভুক্ত মহব্বত বুঝানো হয়েছে। স্বভাবজাত মহব্বত নয় যা স্বাভাবিক ভাবে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পুত্রের জন্য হয়ে থাকে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে। প্রথমতঃ যাবতীয় বিষয় বস্তু থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত অধিক হওয়া। দ্বিতীয়তঃ যাকেই ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসবে। তৃতীয়তঃ ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া আগুনে পড়ে যাওয়া থেকেও অধিক কষ্টকর।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জীবন ব্যতীত বাকী সব বস্তু থেকে আপনি আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। রাসূল (সাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তি প্রকৃত মো'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে তার নিজের জীবন থেকেও অধিক মহব্বত না করবে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাঃ) আপনি আমার জীবন থেকেও অধিক প্রিয়। রাসূল (সাঃ) বললেন, ওমর! তুমি এ মাত্রই প্রকৃত মো'মিন বলে গণ্য হলে। অথবা তোমার এখন বুঝে আসল? অথচ এ বিষয়টি পূর্বেই বুঝে আসা উচিত ছিল। হযরত সোহায়েল তসতরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-কে আপন অভিভাবক মনে করে না করে এবং নিজর নফস্‌কে নিজের অধীন মনে করে, সে ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। এক সাহাবী

রাসূল (সাঃ)-কে দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কবে হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, কিয়ামতের জন্য এমন কি পাথেয় প্রস্তুত করে রেখেছ যে, এত অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) নামায, রোযা, সদ্‌কা খয়রাত খুব একটা জমা করতে পারিনি, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বত আমার অন্তরে আছে।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি যাকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন তুমি তাঁর সাথে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) হযরত সফ্‌ওয়ান (রাঃ) ও হযরত আবুযর গেফারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা তাঁরা যতটুকু শুনে যতটুকু আনন্দিত হয়েছিলেন অন্য কোন কথায় এতটুকু আনন্দিত হননি। কেন হবেন না? তাঁদের প্রতিটি শিরা উপশিরা রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে ছিল পরিপূর্ণ। হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বাড়ী, রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ী থেকে একটু দূরে ছিল। একদিন রাসূল (সাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেন, আমার মন চায় তোমার বাড়ীটা যদি আমার বাড়ীর কাছে হত! হযরত ফাতিমা (রাঃ) আরয করলেন, আব্বাজান! হারেসা (রাঃ)-এর বাড়ী আপনার বাড়ীর সবচেয়ে কাছে। আপনি বললেই আমার বাড়ীর সাথে তাঁর বাড়ী বদলে নেয়া যেতে পারে। তিনি (সাঃ) বললেন, এর পূর্বেও তাঁর সাথে একটি বাড়ী আমি বদল করেছি, এখন আবার এ কথা বলতে লজ্জাবোধ হচ্ছে। হযরত হারেসা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর এ অভিপ্রায় জানতে পেরে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাঃ) আমি ও আমার যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যই। আমি জানতে পেরেছি, ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ী নাকি আপনার কাছে আনতে চান। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাড়ী থেকে অন্য কারও বাড়ী এর চেয়ে কাছে নেই। যে কোন বাড়ী বদল করতে আমি প্রস্তুত। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমার যে মালটিই আপনি গ্রহণ করবেন, তা এ মাল থেকে উত্তম যা আমার কাছে রয়ে যাবে। রাসূল (সাঃ) তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বরকতের জন্য দোয়া করে একটি বাড়ী বদল করে নিলেন।

একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) আপনার মহব্বত আমার অন্তরে আমার জান মাল, পরিবার

পরিজন সবকিছু থেকে অধিক। আমি যখন ঘরে থাকি আর আপনার কথা মনে পড়ে যায়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত খিদমতে হাযির হয়ে আপনাকে এক নযর দেখে না নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন হুশ থাকে না। কিন্তু আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি, মৃত্যু তো অবশ্যই আমার কাছেও আসবে, আপনার কাছেও আসবে। আপনি তো জান্নাতে চলে যাবেন , আমি তো আর আপনাকে দেখতে পাব না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) চুপ রইলেন, ইত্যবসরে হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহি সাল্লাম এসে এ আয়াত পাঠ করলেন।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ـ

অর্থ ঃ যাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের তাবেদারী করবে তাঁরা পরকালে ঐসমস্ত লোকের সাথে থাকবে যাঁদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন। (আর তাঁরা হলেন) আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শহীদান ও নেককারগণ এবং এসব লোক তাঁদের সাথী হবেন। তাঁদের সাথে হাশর হওয়াটা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকের আমল সর্ম্পকে যথেষ্ট অবগত আছেন। রাসূল (সাঃ) উক্ত সাহাবীকে এ আয়াত শুনালেন। অপর একজন সাহাবীও রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এসে আরয করলেন, আমি আপনাকে এত বেশী মহব্বত করি যে, আপনার কথা মনে পড়লেই আমি দরবারে হাযির হয়ে এক নজর না দেখলে আমার জান বের হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) আমার চিন্তা হচ্ছে যে, আমি যদি জান্নাতেও যাই তবুও তো আপনার নীচেই থাকব। তখন আপনার যিয়ারত ব্যতীত আমি জান্নাতে কি করে থাকব? রাসূল (সাঃ) তাঁকেও উপরোক্ত আয়াত শুনালেন। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) একজন আনসারীকে খুবই চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত চিন্তিত কেন? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) প্রত্যেহ সকাল বিকাল খিদমতে হাযির হয়ে আপনার দর্শন লাভে ধ্যন্য হই। কিন্তু কাল কিয়ামতে আপনি তো আম্বিয়াদের স্থানে পৌছে যাবেন। আমরা তো সেখানে পৌছতে পারব না। রাসূল (সাঃ) চুপ রইলেন, যখন এ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তাঁকে সুসংবাদ দিলেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার পরে এমন লোক সৃষ্টি

হবে যারা আমাকে এতই মহব্বত করবে যে, তারা আপন পরিবার পরিজন এবং জান মালের বিনিময়ে হলেও আমাকে এক নজর দেখার আকাংখা করবে।

হযরত আবদাহ্ বিন্‌তে খালেদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, আমার পিতা রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন শুধু রাসূল (সাঃ) এবং আনসার ও মুহাজের সাহাবীদের নাম নিয়ে বলতেন, এরাই আমার মূল ও শাখা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বংশধর। তাঁদের প্রতি আমার অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে। হে আল্লাহ্! শ্রীঘ্র মৃত্যু দান করে আমাকে তাঁদের সাথে মিলিত কর। তিনি এসব কথা বলতে বলতে নিদ্রা যেতেন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আমার পিতার চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণে আমি বেশী আনন্দিত। কেননা আমার পিতার চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণ রাসূল-এর কাছে অধিক প্রিয়। একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী রাতের বেলায় পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মহল্লায় বের হন। তিনি এক ঘরে বাতির আলো এবং এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। মেয়েলোকটি পশম বুনার তালে তালে কবিতা আবৃত্তি করছিল। যার অর্থ এ নেককার ও বুজুর্গ লোকদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরূদ বর্ষিত হোক! হে আল্লাহর নবী! নিশ্চয় আপনি রাতের বেলায় ইবাদত করতেন এবং শেষ রাত্রে উঠে কান্নাকাটি করতেন। হায় আমি যদি জানতাম, আমি আর আমার মাহবুব নবী একত্রিত হব না? কেননা মৃত্যু যে কোন অবস্থায় এসে পড়ে জানা নেই, আমার মৃত্যু কি অবস্থায় আসবে? আর আমি রাসূল (সাঃ) -এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাব কি না? হযরত ওমর (রাঃ) কবিতাগুলো শুনে কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই বসে গেলেন।

হযরত বেলাল হাব্‌শী (রাঃ)-এর মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী দুখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগলেন, হায় আফসোস! এ কথা শুনে তিনি (রাঃ) বললেন, সোবহানাল্লাহ! তুমি আফ্‌সোস করছ? অথচ কি মজার ব্যাপার যে, আগামীকাল আমার প্রিয়নবীর যিয়ারত করব এবং তাঁর সাথীদের সাক্ষাত করব। হযরত যায়েদ (রাঃ) এর এক ঘটনা, যখন তাঁকে শূলে চড়ানো হল, তখন আবু সুফিয়ান বলেছিল, হে যায়েদ! তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হোক আর (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদকে (সাঃ) তোমার পরিবর্তে শূলে চড়ানো হোক। তখন নবীর জন্য জীবন উৎসর্গকারী হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেছিলেন,

আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমি এতটুকু সহ্য করব না যে, আমার মাহবুব নবী ঘরে থাকা অবস্থায় ও তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি নিজ ঘরে আরামে বসে থাকি। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বলে উঠল, আমি কোথাও কাকেও এত বেশী মহব্বত করতে দেখিনি, যেরূপ মুহাম্মদকে তাঁর অনুসারীরা মহব্বত করে থাকে। ওলামায়ে কিরামগণ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মহব্বতের কয়েকটি নির্দশন লিখেছেন–কাজী আয়ায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভালবাসে সে যাবতীয় বস্তু থেকে তাকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। এটাই মহব্বতের প্রকৃত অর্থ, নচেত তা মহব্বত নয়, এরং মহব্বতের দাবী মাত্র। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মহব্বতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁর নির্দেশনা অবলম্বন করা, তাঁর আচার ব্যবহার, চাল চলনের অনুসারী হওয়া, তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পুংখাঁনো পুংখরূপে পালন করা। সুখে-দুখেঃ সর্বাবস্থায় তাঁর পথে চলা। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাতেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল, বড় দয়ালু।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকজন নিষ্ঠাবান সাহাবা পরিচিতি

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম সহচর এবং তাঁর বাণী ও কর্মের উৎসাহী প্রচারক ও প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম নিয়ে সর্বাধিক মতানৈক্য বিদ্যমান। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি 'আবদু শামস্' বা 'আবদু ওমর' নামে খ্যাত ছিলেন। ইসলাম-উত্তর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'আবদুর রহমান ইবনে সাখর' অথবা 'উমায়ের ইবনে আমির'। অবশ্য তিনি ইসলামী জগতে "আবু হুরায়রা" এ উপনামে সমধিক পরিচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৬২৯ ঈসায়ী সনে ৭ হিজরী হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের অন্তবর্তী সময় মদীনায় আগমন করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মত। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়িল ইবনে আমর আদ্‌দাওসীর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন। এর পর হতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শোনার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেন। তিনি আসহাবুস্ সুফ্‌ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর গোটা জীবন রাসূল (সাঃ)-এর একান্ত সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। ফলে রাসূলের কাছ থেকে যত হাদীস শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে অন্য কোন সাহাবীর তা হয়নি। হাদীসের প্রসার ও প্রচারের এক বিরাট খিদমত তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৫,৩৭৫টি। রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ ছাড়াও আবু হুরায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর, উমর, ফাদল ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব, উসামা, আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখ হতে হাদীস গ্রহণ করেন এবং বর্ণনা করেন। বুখারীর বর্ণনা মতে আটশত রাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জাবির, আনাস, ওয়াসীল ইবনে আসকা (রাঃ) প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলামী শরীয়তে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বিদ্যাবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এ কারণে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। রাসূল (সাঃ)-এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তথা ইসলামের বহু অমূল্য শিক্ষার প্রসারদানে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর এ কীর্তি মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। হাদীসে নববীর এ মহান খাদেম ৭৮ বছর বয়সে মদীনার অদূরে 'কাস্‌বা' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা মতে তিনি ৫৭ অথবা ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী সুফিয়ান তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তাঁর জানায়ায় শরীক হন। তাঁকে মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর হিযরাতের তিন বছর পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মক্কার "শিয়াবে আবী তালিব"-এর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পরই তাঁকে রাসূলের কাছে নেয়া হলে তিনি শিশু আবদুল্লাহর মুখে একটু থুথু দিয়ে তাঁর 'তাহনীক' করেন। (তাহনীক অর্থ কোন বস্তু চিবিয়ে নরম করা এবং শিশুকে সভ্য করা) এর ফলশ্রুতিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পরবর্তী জীবনে অঘাধ জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মাতা লুবাবা বিন্‌তুল হারিস হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হয়। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বাল্যকাল হতে রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আট অথবা দশ বছর হযরতের গভীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের সময় তিনি ছিলেন তের কিংবা পনের বছরের বালক। অপরিণত বয়সের কারণে তিনি রাসূলের জীবদ্দশায় কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। রাসূল (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তিনি খ্যাতনামা সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের কাছ হতে রাসূলের হাদীস শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর বিশেষ পরামর্শ দাতা ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহীগণ কর্তৃক মদীনায় স্ব-গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সে বছর ইব্‌নে আব্বাসকে আমীরুল হজ্ব নিযুক্ত করা হয়েছিল বিধায় তিনি উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতকালে মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। এর কিছু দিন পর মদীনায় পত্যাবর্তন করে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে বয়াত হন। তিনি ৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত

যথাক্রমে জঙ্গে জামাল এবং জঙ্গে সিফ্‌ফীনে হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাদলের একটি অংশের সেনাপতিত্বের দাযিত্ব পালন করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সিফ্‌ফীনে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর শাসনামলে বসরার গভর্নর ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে কতিপয় কারণে তিনি বসরা পরিত্যাগ করে মক্কা চলে যান। ইব্‌নে আব্বাস আশৈশব রাসূলের গভীর সান্নিধ্য ও তাঁর পবিত্র খিদমতে কাটিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমতের পরিপূর্ণতার জন্য রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ার বদৌলতে এবং প্রখর মেধা ও অসাধারণ মুখস্থ শক্তির কারণে তিনি রাসূলের কাছে হতে বহু হাদীস হৃদয়পটে সংরক্ষিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সর্বমোট ২,৬৬০ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি যুবায়রের শাসনামলে ৬৮ হিজরীতে তায়েফে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। মুহাম্মদ ইব্‌নে হানফিয়া তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)

নাম আনাস, পিতার নাম মালেক, মাতার নাম উম্মে সুলায়ম। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর খালা ছিলেন। এ হিসাবে সম্পর্কের দিক দিয়ে আনাস রাসূল (সাঃ)-এর খালাত ভাই। রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় হিযরত করেন তখন আনাসের বয়স মাত্র দশ বছর। এ সময় তাঁর মাতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণে অসন্তুষ্ট হয়ে আনাসের পিতা শামে চলে যায় এবং তথায় ইন্তিকাল করে। আনাসের পিতার মৃত্যুর পর উম্মে সুলায়ম ইসলাম গ্রহণের শর্তে হযরত আবু তালহার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এরপর বালক আনাসের লালন-পালনের ভার আবু তালহার উপর অর্পিত হয়। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বালক আনাসকে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করলে তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ দশটি বছর তিনি তাঁর একনিষ্ঠ খিদমতে অতিবাহিত করেন।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। কেননা তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। অবশ্য এ সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। অল্প বয়সের কারণে তিনি উহুদে অংশ নিতে পারেননি। খায়বরসহ পরবর্তী সকল সমরাভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁকে প্রথমে বাহরাইনের আমেল এবং পরে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত

উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি ইলমে হাদীসের খিদমতে বসরায় ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হলে তিনি সম্পূর্ণ নীরব জীবন-যাপন করেন। তিনি দীর্ঘ দশটি বছর রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। ফলে বহু হাদীস শিক্ষার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি ইলমে হাদীসের বিশেষ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রায় সমগ্র জীবন তিনি হাদীস প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শেষ জীবনে বসরায় জামে মসজিদ ছিল তাঁর হাদীস প্রচারের কেন্দ্র। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স বিভিন্ন বর্ণনা মতে ৯৭ হতে ১০৭ বছরের মধ্যে ছিল। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৯১ বা ৯৩ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের সময় বসরায় অন্য কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। আরো জানা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে রাসূল (সাঃ)-এর অন্য কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। কাতান ইব্‌নে মুদরাক তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। হযরত আনাস (রাঃ)-কে তাঁর বাসভবনের পাশে সমাহিত করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ)

নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম মাসউদ। কুনিয়াত আবু আবদির রহমান আল-হুজালী। মাতার নাম উম্মু আব্‌দ। রাসূল (সাঃ) যে দিন দ্বারে আরকামে প্রবেশ করেন তার পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজে গৌরব দীপ্তকণ্ঠে বলতেন "আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।" ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক তাঁকে ৩৩তম এবং সিয়ারে আলামুন্নুবালা গ্রন্থে ১৭তম মুসলিম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মক্কা নগরীতে রাসূলুল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উচ্চঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করার সাহস পেত না। ইব্‌নে মাসউদ মক্কার প্রথম মুসলমান যিনি কোরেশদের পক্ষ থেকে মারাত্মক বিপদের আশংকা সত্ত্বেও উচ্চঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করেন। অবশ্য এ জন্য তাঁকে নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কোরেশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু' দুবার আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। পরে তিনি স্থায়ীভাবে মদীনায় হিযরত করেন। তথায় তিনি হযরত মায়ায ইব্‌নে জাবাল (রাঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং পরে রাসূল (সাঃ) তাঁদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন।

তিনি প্রসিদ্ধ সকল যুদ্ধে অসীম শৌর্য-বীর্য নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করেন। হুনায়ন যুদ্ধে তাঁর

বিশেষ ভূমিকা ছিল। উমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে ১৫ হিজরীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ৬৪০ ঈসায়ী সন ২০ হিজরীতে তিনি কুফার কাজী নিযুক্ত হন। একই সাথে কোষাগার, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং কুফা প্রশাসকের মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি পরিপূর্ণ সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ দশ বছর এ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে যখন গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রবল হয়ে উঠে, তখন ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ)-কে হঠাৎ বরাখাস্ত করা হয়। এ নির্দেশ তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে হিজরী ৩২ অথবা ৩৩ সনের ৯ই রমযান ভিন্ন মতে ৮ই রমযান ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের অধিক। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে খলীফা উসমান (রাঃ) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর অন্তিম অসীয়ত অনুসারে জান্নাতুল বাকীতে উসমান ইব্‌নে মাজউন (রাঃ)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)

রাসূল (সাঃ) যখন তায়েফ অবরোধ করলেন, তখন তিনি তায়েফ-বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, যে সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে মিলিত হবে, তারা নিরাপদ থাকবে এবং যে সমস্ত ক্রীতদাস তাদের মালিকদেরকে পরিত্যাগ করে চলে আসবে তাদেরকে আযাদ বা মুক্ত ঘোষণা করা হবে। এ ঘোষণা তায়েফের বুকে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বহু গোলাম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরম আযাদী লাভ করেও তিনি আজীবন নিজেকে রাসূলের গোলাম হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন এবং এর মাঝেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)-এর পূর্ব মনিব রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে তাকে মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিল, কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদতের পর সৃষ্ট সম্ভাব্য ফিতনা থেকে তিনি দূরে থাকেন। আর এ কারণে তিনি আত্মঘাতী উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ নেননি। পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত

মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার অনুষ্ঠিত অনাকাংখিত সিফ্‌ফীন যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং সম্ভাব্য পরিমাণ অন্যান্যদেরকেও এ যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখেন। হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া পরহেযগারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলেও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণীর এক বিশাল ভাণ্ডার আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি সর্বমোট ১৩২টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)

আবু মাসউদ (রাঃ) হিযরতের দু' এক বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের ১৩তম বছর তিনি মক্কায় গিয়ে বাইয়াতে আকাবায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসূলের হাতে এ বাইয়াতের সর্ব কনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন তিনি। তিনি বদর, উহুদসহ সকল ইসলামী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে মদীনা হতে কুফা চলে যান। এক বর্ণনা মতে সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুবাবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে আবু মাসউদ হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে যাত্রার প্রক্কালে আলী (রাঃ) তাঁকে কুফায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। এ সময় তিনি ইমামতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর তিনি কুফা হতে মদীনা চলে যান এবং সেখানে জীবনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। আবু মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। তিনি ১০২টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ৪১ থেকে ৫০ হিজরীর মধ্যে কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন বলে চরিতকাররা উল্লেখ করেন।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ)

ইসলাম পূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল আবদু আমর অথবা আবদুকা'বা। পিতার নাম আউফ। মাতার নাম শিফা বিন্‌তু আউফ। তাঁর মাতা-পিতা উভয় ছিলেন যুহরা গোত্রের লোক। তিনি আমুলফীলের দশ বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। এ হিসাবে তিনি রাসূলের দশ বছরের ছোট। অবশ্য ইব্‌নে হাজার তাঁকে রাসূলের তের বছরের ছোট বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) প্রথম স্তরের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলামে দীক্ষিত হন। নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রযব মাসে হাবশায় প্রথম যে মুসলিম কাফেলাটি হিযরত করেন তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি মদীনাতেও হিযরত করেন। এভাবে তিনি 'সাহিবুল হিযরাতাইনে'র গৌরব অর্জন করেন। মদীনায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে সা'দ ইবনে রাবী আল খাযরাজীর সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। মদীনাতে তিনি এক আনসারী মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

হযরত আবদুর রহমান বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল অভিযানে রাসূলের সাথে ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি একত্রিশটি আঘাতপ্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে 'দুমাতুল জান্দালে' প্রেরিত অভিযানে রাসূল (সাঃ) তাঁকে সৈন্য বাহিনীর পরিচালনার ভার প্রদান করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের সাথে ছিলেন। নবম হিযরীতে তাঁবুক অভিযান কালে এক ফযরের নামাযের তিনি ইমামতি করেন এবং রাসূল (সাঃ) তাঁর ইক্তিদা করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি ফাতওয়া দানকারী মাত্র আটজন বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম একজন ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। খলীফা উমর (রাঃ) খিলাফতের প্রথম বছর আবদুর রহমান (রাঃ)-কে আমীরে হজ্ব নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। হযরত উমরের ছুরিকাহত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামায়াতের ইমামতি করেন এবং প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তৃতীয় খলীফা হিসাবে হযরত উসমান (রাঃ)-এর নাম ঘোষণা দেন। তিনি আমরণ খলীফা উসমানের মজলিসে শূরার সদস্য থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। হযরত আবদুর রহমান রাসূল (সাঃ) হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সর্বমোট ৬৫টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তাঁর থেকে ইবরাহীম, হুমায়েদ, উমর, মুসয়াব, আবু সালামা, মিসওয়াব, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জুবাইর, জাবির, আনাস, মালিক ইবনে আওস প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌নে সা'দের মতে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। অবশ্য ইব্‌নে হাজারের মতে তিনি ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান (রাঃ) অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

হযরত আদী ইব্‌নে হাতেম (রাঃ)

হযরত আদী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পিছনে এক দীর্ঘ ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর বংশ দীর্ঘদিন ধরে তয়ী গোত্রের উপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল। ইসলামের আবির্ভাবে শঙ্কিত হয়ে হযরত আদী স্বগোত্রীয়দেরকে নিয়ে শামের ঈসায়ী বন্ধুদের কাছে গমন করেন। ঘটনাক্রমে আদী (রাঃ)-তাঁর এক পত্নীকে ফেলে রেখে যান। সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অর্পিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যে রাসূল (সাঃ) তাকে নিরাপত্তার সাথে তার স্বামী আদীর কাছে প্রেরণ করেন। স্ত্রীর কাছে নতুন রাসূল (সাঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা শুনে তাঁর অন্তরে রেখাপাত করে। ফলে তিনি অনতিবিলম্বে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে স্বধর্ম ত্যাগীদের এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের প্রাদুর্ভাব ঘটলে হযরত আদী (রাঃ) তাঁর গোত্রকে কঠোর শাসনের মাধ্যমে এটা থেকে নিভৃত রাখেন। এমনকি তিনি নিজে যাকাত আদায় করে খলীফার কাছে উপস্থিত করতেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ১৩ হিজরীতে ইরাক বিজয় অভিযানে হযরত আদী (রাঃ) তাঁর তায়ী গোত্রকে নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মুসাল্লার নেতৃত্বে হিরার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। এ সময় তিনি ছোট বড় সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শামের কোন কোন বিজয় অভিযানে তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সাথে ছিলেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসন পদ্ধতিতে হযরত আদী (রাঃ)-এর মতানৈক্য থাকার কারণে এ সময় তিনি সম্পূর্ণ নীরব জীবন-যাপন করেন। তাঁর শাহাদতের পর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং উষ্ট্রের ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন। সিফ্‌ফীনের পরে অনুষ্ঠিত নাহরাওন যুদ্ধে তিনি আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল চরিত্রের এক বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর দানশীলতা, বদান্যতা ছিল বর্ণনাতীত। ইবাদত-বন্দেগী খোদাভীতি এবং রাসূল প্রেমে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি ছিলেন স্বগোত্রের একজন ন্যায়বান ও দয়ালু শাসক।

হযরত আদী (রাঃ) সর্বমোট ৬৬টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পরও ৩০ বছর জীবিত ছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পর তিনি কুফায় নির্জন জীবন-যাপন করেন এবং এখানে তিনি ৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হুদায়বিয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম

গ্রহণ করে তিনি সর্ব প্রথম হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বাইয়াতে রেওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে স্বগোত্রে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁর আহ্বানে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক এক পর্যায়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। খিলাফতের প্রথম দিকের তাঁর জীবন প্রবাহ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। হযরত আলী (রাঃ)এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। এরপর তিনি শামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। হাদীস প্রচার এবং প্রসারের নিমিত্বে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁর করায়ত্ব ছিল। তিনি সর্বমোট ২৫০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি উমাইয়া শাসক আবদুল মালেকের শাসনামলে ৮৬ হিজরীতে শামে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মুগাফ্ফাল (রাঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রথম তিনি হাদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বাইয়াতে রেযওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। খায়বার যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এরসাথে ছিলেন। নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাঁবুক যুদ্ধ সওয়ারী এবং মাল-সম্পদের অভাবে অংশ নিতে পারবেন না, এ দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ইব্নে ইয়াসিন নামে এক ব্যক্তির সাহায্যে তিনি এবং তাঁর এক সাথী আবদুর রহমান ইব্নে কা'ব তাঁবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের এ নিঃস্বতার বর্ণনায় সূরায় তওবায় নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

রাসূল (সাঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি মদীনাতে ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় বসরা বিজিত হলে তিনি বসরার লোকদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীদের তথায় প্রেরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করেছিলেন। ইরাকী বাহিনীতে তিনি বীরচিত অংশ নিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর কয়েক বছর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর থেকে তিনি বহু হাদীস মুখস্থ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সর্বমোট ৪৩টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।

তিনি মতান্তরে ৫৯ অথবা ৬০ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী সাহাবী আবু বরজাহ আসলামী (রাঃ) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তাঁকে বসরাতে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি সাতজন সন্তান-সন্ততি রেখে যান।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উনাইস জুহানী (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উনাইস (রাঃ) দ্বিতীয় আকাবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মক্কা এসে রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি মদীনায় হিযরত করেছিলেন। আর এজন্যই তাঁকে 'মুহাজিরী আনসার' বলা হত। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী মাযায ইব্নে জাবালের সাথে মদীনায় বনু সালামার প্রতিমা ভেঙ্গে ছিলেন। বদর, উহুদসহ ইসলামের যাবতীয় যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর দ্বারা রাসূল (সাঃ) ইসলামের ঘোরতর শত্রু খুলদ ইব্নে শায়খ আম্বরীকে হত্যা করান। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি ব্যথিত হৃদয়ে মদীনা ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে উপকূলীয় সিরিয়ার গাজা শহরে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবত যুদ্ধাভিযানে তিনি মিসর ও আফ্রিকা ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। এ বর্ণনা মতে তিনি মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। এক বর্ণনা মতে তিনি ৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার সন্তান রেখে যান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত ইবাদত গুযার ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কোন অবদান পরিলক্ষিত না হলেও তিনি যে রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট ২৪টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কবান ছিলেন। সম্ভবত এজন্যই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম। রাসূল (সাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ (রাঃ), আবু উমামা (রাঃ), বুসর ইব্নে সায়ীদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্নে উমাইয়া, আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে হুযাফা (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে হুযাফা প্রাথমিক পর্যায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আপন ভ্রাতা কায়সের সাথে আবিসিনিয়ায় হিযরত করেছিলেন। হযরত

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু এ মত শুদ্ধ নহে। রাসূল (সাঃ) পারস্য সম্রাট কিস্‌রার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে যে পত্রখানা প্রেরণ করেছিলেন এটা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুযাফা (রাঃ) বহন করে সেই সুদূর পারস্যে গিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) কোন এক যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি মিসর বিজয়েও অংশ নেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) রোম অভিযানে যে বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এতে আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুযাফা (রাঃ) ছিলেন। এ যুদ্ধে রোমক বাহিনী কর্তৃক কিছু সংখ্যক মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে তিনিও বন্দী হন। রোমানরা তাঁকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, কিন্তু সব তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে অতি বিচক্ষণতার সাথে স্বীয় ও অন্যান্য ৮০ জন মুসলিম বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত সকল বন্দীসহ তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে প্রত্যাগমন করলে খলীফা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালে মিসরে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যায়দ (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যায়দ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার সঠিক সন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু পাওয়া যায় যে, তিনি বাইয়াতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের ঘটনা হল, বর্তমানে আমরা যে আযানের শব্দ শুনতে পাই এটা তাঁর স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় বনু হারিসের পতাকা তাঁর হাতে ছিল বিদায় হজ্বের সময়ও রাসূর (সাঃ)-এর সাথে থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি হিজরী ৩২ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। কারো কারো মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ইমাম বুখারীর মতে তাঁর থেকে আযান সম্পর্কিত শুধুমাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। কিন্তু হাফেয ইব্‌নে হাজার তাঁর থেকে বর্ণিত ৬/৭টি হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্রে সংকলন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আবদুর রহমান ইব্‌নে আ'বী লায়লা প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু সালাবা খাশানী (রাঃ)

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। বাইয়াতে রেদওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি ইসলামী কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (সাঃ) তাঁকে খয়বরের গনীমতের মাল প্রদান করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে, তিনি এ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অবশ্য তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের মহান কাজে জীবনের বেশী সময় ব্যয় করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ইসলাম প্রচারক হিসাবে স্ব-গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার ফলশ্রুতিতে রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশেষ মর্যদার অধিকারী হন। শাম বিজয় হওয়ার পর তিনি সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি নীরব ভূমিকা পালন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে তিনি শুধু মাত্র ইবাদত বন্দেগীতেই মশগুল থাকেন। জীবনের শেষ প্রহরগুলো তিনি আল্লাহ্‌র আরাধনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। কোন এক গভীর রাতে তিনি নামায আদায়ে নিমগ্ন ছিলেন। এ সময় তাঁর পুত্র স্বপ্নে দেখলেন যে তার পিতা ইন্তিকাল করেছেন। হতবিহবলিত কণ্ঠে পিতাকে ডাক দিলে তাঁর সাড়া পাওয়া গেল, কিন্তু পরক্ষেণেই যখন ডাক দেয়া হল তখন আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। কাছে গিয়ে দেখল সিজদা অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলেন গিয়েছেন। চরিতকারদের মতে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর রাজত্ব কালে, মতান্তরে ৭৫ হিজরীতে খলীফা আবদুল মালেক ইব্‌নে মাওয়ানের রাজত্বকালে ইন্তিকাল করেন। তিনি সাহাবাদের যাবতীয় গুণাবলীরই অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁর বিশেষ একটি গুণ ছিল যে, তিনি ছিলেন সত্য কথনে নির্ভীক দুর্জয় সৈনিক। কখনও জিহ্বা মিথ্যা দ্বরা কলঙ্কিত হয়নি। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট ৪০টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ)

হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ) অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পিছনে সুন্দর একটি ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। অষ্টম হিজরীতে অমুসলিম অবস্থায় আবু মাহযুরা কয়েকজন মুশরিকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই রাসূল (সাঃ) হুনাইনের যুদ্ধাভিযানের পর ফিরছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের হলে রাসূল (সাঃ) এক স্থানে বিরতি নিলেন এবং মুযাযনিকে আযান দিতে বললেন। মুযাযিন আযান দিলে আবু মাহযুরা এবং তার সঙ্গী-সাথীরা বিদ্রূপাত্যক ও ব্যঙ্গস্বরূপ এটা প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। আবু মাহযুরার

বিদ্রুপাত্যক মনোভাব থাকলেও তার আওয়াজ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সুমধুর ছিল। সুমধুর কণ্ঠ শুনে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে ডাকলেন এবং এ কণ্ঠ কার সে সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। সকলে আবু মাযহুরাকে দেখিয়ে দিল। তার সাথী অন্যান্যরা সকলে চলে গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে আযান দিতে বলেন। আযানের অনেক শব্দ তার জানা থাকায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে এটা শিখিয়ে দেন। আযানের বাক্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মৌখিকভাবে উচ্চারণের সাথে সাথে তার অজান্তেই তার হৃদয়ে গিয়ে লাগে। আর তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর অনুমতি পেয়ে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে তথায় ফিরে আসেন। সেখানে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আমেল ইতাব ইব্‌নে উসাইরের কাছে অবস্থান করেন। তিনি শুধু আযানের দায়িত্বেই নিয়োজিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে সেখানকার নির্ধারিত মুযাযযিন পদে নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি যেহেতু মক্কার নির্ধারিত মুযাযযিন ছিলেন বিধায় তথায় তিনি সর্বদা বসবাস করতেন। এখানেই তিনি ৫৯ হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। তিনি কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এর সু-নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পাওয়া যায়না।

হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ)

ইসলাম গ্রহণ করার দায়ে কাফের কর্তৃক তাঁকে নির্মম অত্যাচার আর অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কুফরী থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে তিনি হাবশায় হিযরত করেন। হিযরতের সেই কঠিনতম মুহূর্ত তাঁর স্ত্রী সোহায়লাহ বিন্‌তে সোহাইল সাথে ছিলেন। সোহায়লা ছিলেন গর্ভবতী। পথিমধ্যে পুত্র মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি হাবশা থেকে এমন এক সময় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন যখন মুসলমানগণ মদীনা হিযরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শরীক হন। এ যুদ্ধে তিনি বীরবিক্রমে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এরপর সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর তিরধানে তিনি বিরহ ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং আমরণ রাসূল (রাঃ)-এর স্মরণে অতিবাহিত করেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলিম বিশ্বের খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর আমলে স্ব-ধর্ম ত্যাগী আন্দোলন, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এবং ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবসহ বিভিন্ন সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বিদ্রোহীদেরকে মূলৎপাটনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনা হতে এক

বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এর একটি অংশের বিশেষ দায়িত্বে হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ) নিয়োজিত ছিলেন। উভয় দলের মধ্যে এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ইসলামের সাহসী সৈনিক আবু হাযায়ফা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। শরয়ী হুকুম আহকাম পালনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। যখনই যে হুকুম অবতীর্ণ হত তিনি এটা যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হতেন। সাহাবাদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিল। তাঁদের গর্ভে আসেম এবং মুহাম্মদ নামে দু'পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বংশ পরম্পরা এ পুত্র দু'জন পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান পরিলক্ষিত হয়না। তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত মোট ৪৫টি হাদীসের সন্ধান বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে।

হযরত আবু বুরদা ইব্‌নে নাইয়ার (রাঃ)

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) আকাবায়ে সানীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ ইসলামের সকর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কেবলমাত্র যে দু'টি অশ্ব ছিল, এর একটির মালিক ছিলেন হযরত আবু বুরদা (রাঃ)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় বনু হারিসার দলীয় পতাকা তিনিই ধারণ করেছিলেন। তিনি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া শাসক হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী ৪১ সনে এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন। হাদীসে নববীর খিদমতের ব্যাপারে তাঁর যৎসামান্য কৃতিত্ব রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত ২০টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

হযরত আসেম ইব্‌নে আদী (রাঃ)

হযরত আসেম (রাঃ) হিযরতের পর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রওয়ানা হন। মসজিদে দেরার পর্যন্ত পৌছে মুনাফিকদের খবর অবহিত হয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁকে কোবা ও আওয়ালীর আমীর নিযুক্ত করে তথায় প্রেরণ করেন। তাই তিনি সক্রিয়ভাবে বদরে অংশ নিতে পারেননি। অবশ্য রাসূল (সাঃ) তাঁকে বদরে প্রাপ্ত গনীমতের অংশ প্রদান করেছিলেন। তিনি উহুদ ও খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি চার খলীফার পূর্ণ যুগ পেয়েছিলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী ৪৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি কত বছর বেঁচে ছিলেন এ ব্যাপারে চরিতকারদের মধ্যে

মত বিরোধ বিদ্যমান। বিভিন্ন বর্ণনা মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১১৫ হতে ১২০ বছরে মধ্যে ছিল। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর থেকে মাত্র ছ'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আসমা বিন্‌তে উমাইস্ (রাঃ)

হযরত আলী (রাঃ)-এর ভ্রাতা যাফর (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মদীনায় আরকামের গৃহে রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থান গ্রহণের পূর্বে আসমা ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তাঁর স্বামী যাফরও তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। আসমা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। সপ্তম হিযরীতে খায়বার বিজয়ের পর মদীনায় আসেন। হিজরী ৮ম সনে মুতার যুদ্ধে হযরত যাফর (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। স্বামী হারানো মর্মবেদনা যে কত নিদারুন যাতনাদায়ক তা সেদিন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। প্রায় ৬ মাস পর ৮ম হিযরীর শাওয়াল মাসে হুনায়ন যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) তাঁকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। (ইসাবা) বিয়ের দু'বছর পর ১০ম হিজরীতে হজ্বের সময় যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে যুলকা'দাহ মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এ ঘরেও তাঁর অবস্থান বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৩ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইনতিকাল করেন। তারপর হযরত আসমা (রাঃ)-কে হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকরও মায়ের সাথে আসেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর যত্নে লালিত-পালিত হন। হিজরী ৩৮ সনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মিসরে শহীদ হন। এতে আসমা (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন, তবে ধৈর্যধারণ করে নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে যান। (ইসাবা) ৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন। তারপর হযরত আসমা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। হযরত আসমা (রাঃ) হতে ৬০ খানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)

হযরত ইমরান (রাঃ) হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। একই সাথে তাঁর পিতা এবং ভগ্নিও ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি হুনাইন এবং তায়েফ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত ইমরান (রাঃ) সদাসর্বদা মদীনা আসা যাওয়া করতেন। রাসূল (সাঃ)-এর বিয়োগে তাঁর হৃদয়ে এত আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনি মদীনায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেন এবং সাধারণ জীবন ধারণ করতে থাকেন। এ কারণে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যাবলী থেকে দূরে থাকেন। হযরত

উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বসরা নগরী ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি তথায় গিয়ে আবাস গৃহ নির্মাণ করে ভিন্নভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বসরার মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফার ইন্তিকালের পর যে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়েছিল এতে অনেক সাহাবী জড়িয়ে পড়লেও তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

বনী উমাইয়াদের শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। উমাইয়া শাসক যিয়াদ তাঁকে খোরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা এ মহান সাহাবী এটা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্মান, মর্যদা ও মহত্বের দিক দিয়ে তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বসরার কোন সাহাবী তাঁর সমপর্যায়ের ছিলেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর অনেক সময় রাসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। রাসূল (সাঃ)-এর অনেক হাদীস শ্রবণ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এজন্য রাসূল (সাঃ)-এর বহু হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বলেন আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে পরাপর দু'দিন হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যার মধ্যে একটি হাদীস দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হবেনা। এতদসত্ত্বেও তিনি হাদীসের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক থাকার কারণে সর্বমোট ১৩০টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি ৫২ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ)

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলহে হুদায়বিয়াতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। বাইয়াতে রেযওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। খায়বর যুদ্ধে সকলের পূর্বে তিনি রণাঙ্গনে অবতরণ করেন। হুনাইন যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তিনি হাতে আঘাত পেয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে ইসলামের বিরুদ্ধে সাতটি যুদ্ধে তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত তিনি মদীনাতে অবস্থান করেন। উমর (রাঃ)-এর সময় কুফা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি তথায় চলে যান এবং স্বীয় আসলাম গোত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কাল হতে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত পর্যন্ত দীর্ঘ দিন কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় খারেজীদের উদ্ভব ঘটলে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অন্যান্য মুসলমানদেরকেও তিনি এ ব্যাপারে উদ্বদ্ধ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর দীর্ঘদিন মদীনাতে রাসূল (সাঃ)-এর একান্ত সাহচর্য লাভ করার কারণে তিনি হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার হৃদয়পটে প্রথিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট ৯৫টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। উমাইয়াদের শাসনামলে তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ৮৬ থেকে ৮৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। কুফায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি হলেন সর্বশেষ সাহাবী।

হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ)

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে মক্কায় হজ্বের মৌসুমে রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াতে সর্ব প্রথম যে ছ'জন আনসার সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি আকাবায়ে সানীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৃতীয় আকাবাতেও উপস্থিত ছিলেন। এ আকাবায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে কাওয়াফেল গোত্রের প্রতিনিধ নিযুক্ত করেছিলেন। বদর, উহুদসহ তিনি সকল যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। বাইয়াতে রেদওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে সিরিয়ার কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় মিসর বিজয়ে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সিরিয়া বিজয়ের পর তিনি তথায় কাজী ও মুয়াল্লিম পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি হিমসে বসবাস করতেন। খলীফা উমর (রাঃ) তাঁকে ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। আওযাঈর মতে তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রথম বিচারপতি। তখনকার সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি রাসূল (সাঃ) হতে সর্বমোট **১৮১টি** হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৩৮ হিজরীতে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ার রামলায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে যেমন মতবিরোধ রয়েছে ঠিক তেমনি তাঁকে সমাহিত করার ব্যাপারেও মতভেদ বিদ্যমান।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) স্বীয় স্বামীর সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা উভয় হাবশায় হিযরত করেছিলেন। তথায় তাঁর কন্যা হাবীবার জন্ম হয়।

হাবশায় অবস্থান কালে তাঁর স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে উম্মে হাবীবা তথায় নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে থাকেন। এরই মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিবাহের পয়গাম তাঁর কাছে পৌছে। ৬ অথবা ৭ হিজরীতে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ অথবা ৩৭ বছর। বিবাহের পর উম্মে হাবীবা হাবশা হতে জাহাজযোগে মদীনায় আগমন করেন,, তখন রাসূল (সাঃ) খায়বরে অবস্থান করছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মজবুত ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীসে নববীর উপর অত্যন্ত কঠোর আমল করতেন। তিনি ৬৫টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এবং উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ) থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ৪৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারাতে সমাহিত করা হয়।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ)

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ইসলামী কয়েকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। খায়বরের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের ময়দানে তিনি খাবার তৈরী করা, মালামাল সংরক্ষণ করা, রুগীদের সেবা করা এবং যুদ্ধাহতদের পট্টিবাধা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। সমাজ সেবমূলক কাজে তিনি সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। এলাকার মহিলা মৃতদের গোসলের কাজ তিনিই করতেন। মেয়ে সুলভ সামাজিক কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। খোলাফায়ে রাশেদার দীর্ঘ শাসনামলের কোন এক যুদ্ধে তাঁর এক পুত্র আহত হয়ে বসরায় গেলে তিনিও তথায় গমন করেন। কিন্তু বসরায় পৌছার একদিন পূর্বে তাঁর পুত্র ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বসরার বনু খলফের প্রাসাদে অবস্থান করেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ৪১টি।

হযরত উম্মে হানী (রাঃ)

হুবায়রা ইবনে আমর ইব্‌নে আয়েয আল মাখযুমীর সাথে উম্মে হানীর বিয়ে হয়। হিজরী ৮ সনে মক্কা বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন। রাসূল (সাঃ) সে দিন তাঁর গৃহে গোসল করেন এবং চাশতের নামায আদায় করেন। তিনি নিজ গৃহে আত্মীয় সম্পর্কিত দু'জন মুশরিককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাদের এ আশ্রয় মুঞ্জুর করেন। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড) তাঁর স্বামী হুবায়রা মক্কা

বিজয়ের দিন নাজরানে পালিয়ে যায়। তিনি রাসূল (সাঃ) হতে ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তা সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের সঠিক সময় জানা যায়না।

হযরত কাতাদা ইব্‌নে নোমান (রাঃ)

হযরত কাতাদা (রাঃ) আকাবায়ে সানীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার সময় এক পাষণ্ড মুশরিকের আঘাতে তাঁর এক চক্ষু উপড়ে পড়ে। কিন্তু দেহচ্ছুত চক্ষুটি যথাস্থানে রাখার পর রাসূল (সাঃ) দোয়া করলে আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় এটা পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। এটা এক অত্যাশ্চার্য ঘটনা। কোন কোন চরিতকার এ ঘটনাকে বদরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু এটা যথার্থও সঠিক নয়। মূলতঃ এটা উহুদেরই ঘটনা। ইমাম মালেক, দারকুতনী, বায়হাকী এবং হাফেয ইব্‌নে আবদুল বার এ অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় তাঁর হাতে বনু বকরের পতাকা ছিল। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করেন। রাসূল (সাঃ) হিজরী ১১ সনে উসামা ইব্‌নে যায়দ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন হযরত কাতাদা (রাঃ) এটাতে শরীক ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে হিজরী ২৩ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। খলীফা উমর (রাঃ) তাঁর জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। তাঁকে কবরে রাখার জন্য হযরত উমর (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসলিম (রাঃ) তাঁর কবরে অবতরণ করেন। এটা ছিল তাঁর জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার। মৃত্যুকালে তিনি উমর ও উবাইদ নামে দু'পুত্র রেখে যান।

হযরত কা'ব ইব্‌নে উযরা (রাঃ)

হযরত কা'ব ইব্‌নে উযরা (রাঃ) হিযরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোন এক যুদ্ধে তাঁর একটি হাত কেটে গিয়েছিল। হুদায়বিয়ার ওমরাতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় তাঁর মাথায় এত বেশী উকুন হয়েছিল যে, উকুন তাঁর নাকে মুখে এসে পড়ত। রাসূল (সাঃ) এটা দেখে তাঁকে মস্তক মুণ্ডন করতে বললেন। হযরত কা'ব (রাঃ) তখন যদিও ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, তবুও রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কষ্ট হতে মুক্তি লাভ করেন। ন্যায়ের সমর্থন ও রাসূল প্রীতি—এ দু'টি বস্তু তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিবরানীর "কিতাবুল আউসাত" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন কা'ব রাসূল (সাঃ)-এর

খেদমতে হাযির হয়ে দেখতে পেলেন যে, ক্ষুধায় রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। পথে এক ইহুদীর সাক্ষাত ঘটে। সে তার উটকে পানি পান করাতে ছিল। তখন কা'ব ইহুদীর সাথে প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি খেজুর চুক্তি করে কিছুক্ষণ কূপ থেকে পানি উঠালেন এবং এটাতে যে খেজুর তিনি পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। এটা দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মধ্যে রাসূল প্রীতি কত প্রগাঢ় ছিল। রাসূল (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর তিনি কুফায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত কা'ব (রাঃ), রাসূল (সাঃ), হযরত ওমর (সাঃ) এবং হযরত বিল্লাল (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫১ হিজরীতে ৭৫ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র রেখে যান। তাঁরা প্রত্যেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন—ইসহাক, আবদুল মালেক, মুহাম্মদ ও রাবী।

হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদ

হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদের সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়না। বিভিন্ন বর্ণনা মতে রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ অথবা ২৫ বছর। এ হিসাবে তিনি নবুওয়াতের ১৫ অথবা ১৬ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌নে আসাকির বলেন, হযরত খালিদ (রাঃ) হযরত ওমরের সমবয়সি ছিলেন। হযরত খালিদের নসবনামা হল—খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদ ইব্‌নে মুগিরাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর অথবা আমর ইব্‌নে মাখজুম ইব্‌নে ইয়াকজাহ ইব্‌নে মাররাহ ইব্‌নে কা'ব ইবনে লুববীউল কারাশী। হযরত খালিদ (রাঃ)-এর উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মাররাহ ইব্‌নে কা'ব পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূল (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। প্রাথমিক জীবনে খালিদ ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। বদর, উহুদ এবং খন্দকে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর ভাই ওয়ালিদের আহবানে তিনি ইসলামের প্রতি ক্রমান্বয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি অষ্টম হিজরী মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রথম তিনি মু'তার যুদ্ধে অংশ নেন। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাত্র দু'মাস পরে। এ যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সাইফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাঁবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দমম হিজরীতে বিদায় হজ্বে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে হযরত খালিদের অসাধারণ সামরিক কৃতিত্বের বিকাশ ঘটে। এ সময় তিনি বহু অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম

হন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করে ইয়ারমুক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। অবশ্য যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রথম খলীফার ইন্তিকাল হলে হযরত উমর (রাঃ) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৩ হিজরীতে তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে সাময়িকভাবে বরাখাস্ত করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) এ আদেশ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিক বেশে বাকী যুদ্ধে শরীক থাকেন। কিন্তু হযরত খালিদ কবি আশয়াছ ইবনে কায়েসকে এক হাজার দিনার উপঢৌকন প্রদানের অভিযোগে হযরত উমর (রাঃ) ১৭ হিজরীতে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পদচ্যুত করেন। এর কিছুদিন পর খলীফা তাঁকে রাহা, হিরান, আমদ এবং লারতার অঞ্চল সমূহের গভর্নর নিয়োগ করেন। এ দায়িত্বে এক বছর বহাল থাকার পর তিনি পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, হযরত খালিদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সোয়াশ ভিন্ন বর্ণনায় তিনশত যুদ্ধে সফল অংশ নেন। মহান দ্বিগ্বিজয়ী সেনাপতি হযরত খালিদ (রাঃ) ২১ অথবা ২২ হিজরী মোতাবেক ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। অধিকাংশ চরিতকারদের মতে তিনি হেমসে ইন্তিকাল করেন এবং তথায়ই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি অধিকাংশ সময় ইসলামী সমরাভিযানে কাটিয়ে দেয়ার ফলে হাদীসে নববীর তেমন একটা খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যেতে পারেননি। তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত ১৮টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে মুয়াবিয়া (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু পিতার ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। তিনি হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাতিবে অহীর অন্যতম একজন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি শামের অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষের দিকে রোমীয়রা শামের কোন কোন এলাকা দখল করে নিলে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রোমীয়দের পরাজিত করে সে এলাকা পুনঃদখল করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে কাইসারিয়ার অভিযানে প্রেরণ করলে অতি সহজে তিনি তা দখল করেন। ১৮ হিজরীতে খলীফা উমর (রাঃ) তাঁকে দামেস্কের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি চার বছর এ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অসীম সাহসের জন্য হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে "আরবের কিসরা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) তাঁকে গোটা শাম দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি সর্ব প্রথম সমুদ্র পথে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে অনুষ্ঠিত উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতে আসীন হয়ে প্রশাসনের বহু রদবদল করেন। খলীফা তদানীন্তন শামের গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর স্থলে সহল ইব্‌নে হানীফকে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রাঃ) এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। এখান থেকেই উভয়ের মাঝে মতপার্থক্যের সূচনা হয়। তাঁদের অন্তরকলহের ফলশ্রুতি স্বরূপ মর্মান্তিক সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার করুণ পরিণতি মুসলিম উম্মাহ আজও ভোগ করছে। হিজরী ৪০ সালে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদতবরণ করলে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র আমীর নিযুক্ত হন। তিনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে কুফার পরিবর্তে দামেস্ককে ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর পর একমাত্র তিনি ইসলামী রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। রাষ্ট্রোন্নয়নেও তিনি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) শুধু রাজনৈতিক প্রতিভায় প্রজ্ঞাবান ছিলেন না, বরং তিনি হাদীসশাস্ত্রেও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি সর্বমোট ১৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। এটা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে স্থাপন পেয়েছে। তাঁর থেকে বহু সংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৬০ হিজরী রযব মাসে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌নে কাইস তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে দামেস্কে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

হযরত মায়মুনা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর পূর্ব নাম ছিল বাররা। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিয়ের পর তাঁর নাম রাখা হয় মায়মুনা। পিতার নাম হারেস। মাতার নাম হিন্দ। মাসউদ ইব্‌নে উমাইর সাকাফীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল আবু রেহেম ইব্‌নে আবদুল উয্‌যা। আবু রেহেমের মৃত্যুর পর হযরত মায়মুনা (রাঃ) মক্কায় বিধবা জীবন-যাপন করতে থাকেন। এ অবস্থায় রাসূল (সাঃ) হযরত যাফর ইব্‌নে আবু তালিবকে বিবাহের পয়গাম নিয়ে তাঁর কাছে পাঠান। সপ্তম হিজরীতে শাওয়াল মাসে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহের মাধ্যমে তিনি উম্মুল মুমেনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মক্কার সন্নিকটে সারিফ নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর ভগ্নীপতি হযরত আব্বাস ইব্‌নে আবদুল মোত্তালিব

(রাঃ) এ বিবাহের ওয়ালী নিযুক্ত হন এবং তিনি বিবাহ পড়ান। বিবাহের মোহর নির্ধারিত হয়েছিল পাঁচশত দিরহাম। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর সর্বশেষ স্ত্রী। হযরত মায়মুনা (রাঃ) ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করে। তিনি ৬১ হিজরী মোতাবেক ৬৮১ খৃষ্টাব্দে 'সারিফ' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। এ সারিফেই রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর জানাযা পড়ান এবং তাঁকে কবরে শায়িত করেন। উল্লেখ্য রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল রাসূল (সাঃ)-এর সকল স্ত্রীদের শেষে এবং তিনি তাঁদের সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।

হযরত মিসওয়ার ইব্‌নে মাখরামা (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর হিযরতের পর মক্কা নগরীতে তাঁর জন্ম হয়। জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন মুসলমান। কেননা পিতা-মাতা উভয় ছিলেন মুসলমান। অষ্টম হিজরীতে তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় মিসওয়ার (রাঃ) ছিলেন ৮ বছরের বালক। এতদসত্বেও তিনি সাহাবী হওয়ার মর্যদা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় মদীনাতে অবস্থান করেন। তাঁর শাহাদতে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে অবশেষে মদীনা ছেড়ে মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইয়াযিদ ক্ষমতাসীন হলে তিনি তার হাতে বায়য়াত করাকে অপছন্দ করেন। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় মক্কা হতে মদীনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইয়াদিয খিলাফত আসীন হওয়ার পর সকলের বায়য়াত চাইলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবাইর (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন। ফলে প্রতিহিংসার দাবানলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ইয়াযিদ ৬৪ হিজরীতে হাজ্জাজ ইব্‌নে ইউসুফকে তাদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ দেয়। এ অবরোধে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) ও অবরুদ্ধ হন। কা'বার চত্বরে অবরুদ্ধ অবস্থায় হযরত মিসওয়ার (রাঃ) হাজরে আসওয়াদের পার্শ্বে নামাযরত ছিলেন। এমতাবস্থায় শত্রু বাহিনীর নিক্ষিপ্ত পাথরে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাতের ঠিক পাঁচ দিন পর অবরুদ্ধ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় তিনি মাত্র ৮ বছরের বালক ছিলেন। এতদসত্বেও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী গভীর আগ্রহ নিয়ে শ্রবণ ও মুখস্থ করতেন। তিনি সর্বমোট ২২ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা (রাঃ)

তিনি প্রাথমিক পর্যায় মুসয়াব ইব্‌নে যুবাইর (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারা হযরত আবু উবায়দা

ইব্‌নে জাররাহ (রাঃ)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। বদর যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর বিখ্যাত ইহুদী কবি কা'ব ইবনে আশরাফকে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে হত্যা করেছিলেন। ঘটনাটি বুখারী শরীফে বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তিনি মুসরিম সৈন্যবাহিনীর সংরক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাকারী নাযীর গোত্রকে তিনি ৪র্থ হিজরীতে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। বনী কুরায়যার যুদ্ধেও তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। ৯ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাঁবুক যুদ্ধে গমনের পূর্বে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপর মদীনার রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা (রাঃ)-কে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের তদারকীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত মদীনাতেই ছিলেন। এর পর রাবযায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় সংঘটিত আত্মঘাতী উষ্ট্রের এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করেন। তিনি হিজরী ৪৬ সনে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে নিজ গৃহে সিরীয় কোন্ এক ব্যক্তির তলোয়ারের আঘাতে শাহাদত বরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তদানীন্তন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তিনি সু-দীর্ঘকাল রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সাহচর্যে কাটান এবং তাঁর থেকে অগণিত হাদীস শ্রবণ করেন। কিন্তু তাঁর মাত্র ৬টি রেওয়ায়েত হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

হযরত যায়েদ ইব্‌নে খালেদ আল জুহানী (রাঃ)

৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি মদীনাতে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি স্ব-গোত্রের সাথে ছিলেন। তিনি সর্বমোট ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে বহু মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি ৭৮ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

হযরত যেহ্‌হাক ইবনে সুফইয়ান (রাঃ)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের নব মুসলিমদের নেতা নির্ধারণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় যখন মুসলমানদের সমস্ত গোত্র একত্রিত হতে লাগল তখন তিনি স্বীয় গোত্রের ন"শত মুসলমানদের এক বিরাট দল নিয়ে তথায় আসেন। তিনি

প্রখ্যাত বীর ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য সকল সঙ্কটময় মুহূর্ত উত্তরণের জন্য তিনি নির্বাচিত হতেন। প্রমান স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, রাসূল (সাঃ) ৯ম হিজরীতে হযরত যেহ্হাক (রাঃ)-এর কাবীলা বনী কেলাবের উদ্দেশ্যে যে সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন এটা তাঁরই নেতৃত্বাধীন ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ ছাড়াও তিনি বিশেষভাবে রাসূল (সাঃ)-এর নিরাপত্তার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তিনি কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক 'সিয়াফে রাসূল' বা রাসূল (সাঃ)-এর তলোয়ার এ সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়না। তিনি মাত্র চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত সালমা ইব্নে আকওয়া (রাঃ)

তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্ব প্রথম বাইয়াতে রেজওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর পর অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এতে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। হাওয়াজেন যুদ্ধে তিনি কাফেরদের গুপ্তচরকে হত্যা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি সারিয়্যাতেও অংশ নেন। এর মধ্যে বনী কিলাব সারিয়্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি সাধারণ সৈনিক বেশে অংশ নিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পরও তিনি মদীনাতে ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর তিনি মদীনা থেকে 'রবজাহ' নামক স্থানে চলে যান। এখানে তিনি বিবাহ করে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানে-গুণে অতুলনীয়। রাসূল (সাঃ) থেকে তিনি বহু হাদীস মুখস্থ করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত ৭৭টি হাদীসের সন্ধান বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর কাছ হতে বহু সংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি কোন এক কাজের জন্য রবজাহ থেকে মদীনা আগমন করেন। এর পর তিনি আর রবজায় ফিরে যেতে পারেননি। আল্লাহ্র ডাকে লাববাইক বলে তিনি ৭৪ হিজরী মদীনাতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

হযরত সফওয়ান ইব্নে উমাইয়্যা (রাঃ)

জাহেলী যুগে সফওয়ানের বংশধর অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিল। সে এবং তাঁর পিতা উমাইয়্যা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। হযরত বিলাল (রাঃ) তাদের গোলাম ছিল। বিলালের ইসলাম গ্রহণের দায়ে তারা তাঁকে অমানষিক নির্যাতন করে। বদর যুদ্ধে উমাইয়্যা নিহত হলে সফওয়ান পিতৃ

হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। তাই সে তৃতীয় হিজরীতে সাহাবী যায়দ ইব্নে দাসনা (রাঃ)-কে ক্রীতদাস রূপে ক্রয় করে হত্যা করত প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের সফওয়ান (রাঃ)-এর অন্তর ক্রমশঃ ইসলামের দিকে ঝুঁকতে থাকে। হুনাইনের যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মাল থেকে রাসূল (সাঃ) তাকে একশত উট উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তার হৃদয় রাসূল (সাঃ)-এর উপর দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তিনি গোযওয়ায়ে তায়েফের অব্যবহিত পরই পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত হন। অবশ্য তাঁর স্ত্রী তাঁর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেননি। এমনকি উভয়ের বিবাহ পুনঃ নবায়নও করেননি। হিযরতের ফযিলত অবহিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর পরই হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। তথায় তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদীনায় তাঁর পদার্পণের খবর রাসূল (সাঃ) জানতে পেরে তাঁকে বললেন, ফতেহ মক্কার পর কোন হিযরত নেই। তাই তুমি মক্কায় চলে যাও। রাসূল (সাঃ) এ নির্দেশ পেয়ে তিনি মক্কায় চলে আসেন এবং বাকী জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালিত হলে তিনি এতে অংশ গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি উমাইয়্যা এবং আবদুল্লাহ নামে দু'পুত্র সন্তান ইয়াদগার রেখে যান। তিনি শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করলেও রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক হাদীসে নববী তিনি রেওয়ায়েত করেন।

হযরত সুরাকা ইব্নে মালেক (রাঃ)

ইসলাম দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি ইসলাম বৈরী এবং রাসূল (সাঃ)-এর চরম শত্রু ছিলেন। মক্কা থেকে হিযরতের পরপরই কুরাইশ কর্তৃক মুহাম্মদের দ্বি-খণ্ডিত শির আনার পুরস্কার ঘোষণা হলে তিনি কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে পুরস্কার লাভের উন্মত্ততায় তাঁর পিছনে ছুটেছিল। এতই চরম ছিল তার ইসলাম বিদ্বেষ। হযরত সুরাকা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে রাসূল (সাঃ) হুনায়ন এবং তায়েফের যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে জি'রানা নামক স্থানে সুরাকার সাথে সাক্ষাত ঘটে এবং এ সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। অবশ্য প্রথম অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। বিদায় হজ্বে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করলেও রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

অধিকাংশ সময় তিনি মদীনায় রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কাটাতেন। তিনি তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করে শিষ্টাচার এবং যাবতীয় গুণে গুণান্বিত করে তোলেন। অনেক সময় হযরত সুরাকা (রাঃ) নিজেও রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে অনেক জিনিস জেনে নিতেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি অল্প সময় ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার করায়ত্ব করতে সক্ষম হন। তিন একজন কবিও ছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ২৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি অল্প সময় রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করলেও তাঁর থেকে তিনি মাত্র ১৯টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

হযরত হাফ্সা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা (রাঃ) হলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কন্যা। তাঁর মাতার নাম যয়নব বিন্তে মায্উন। তিনি নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর কুরাইশ বংশের খুনাইস ইব্নে হোযাফার সাথে বিবাহ হয়। হযরত হাফসা (রাঃ) স্বামীর সাথে মদীনা হিযরত করেন। খুনাইস বদর যুদ্ধে আহত হয়ে মদীনায় ইন্তিকাল করলে হাফসা বিধবা হন। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে তাঁর বিবাহের পয়গাম প্রদান করেন। তাঁদের সাথে বিবাহ বন্ধন না হওয়ায় স্বয়ং রাসূল (সাঃ) হাফসার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এ শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের পরের দিন। রাসূল (সাঃ) ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মেনি। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারীণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত গুজার এবং ধর্মপরায়ন রমণী। তিনি রাতে নামায আদায় করতেন আর দিনে রোযা রাখতেন। তিনি সাধারণত নির্লিপ্ত জীবন-যাপন করতেন। তনি রাসূল (সাঃ)-এর অন্যান্য সহধর্মিনীদের ন্যায় খায়বার যুদ্ধের গণীমতের অংশ পেয়েছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর কোষাগার হতে প্রায় এক হাজার দিরহাম ভাতা লাভ করেন। কুরআন সংগ্রহে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি সর্বমোট ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সিহাহ্-সিত্তার হাদীস সংকলন

ইমাম বুখারী (রঃ)

তিনি মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাকেন্দ্র কুভারা নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল ৮১০ ঈসায়ী সনের ২১শে জুলাই শুক্রবার জুমুআর নামাযের কিছু পরে জন্মগ্রহণ করেন। (উল্লেখ্য, বুখারা নগর উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। বর্তমানে এ নগরটি মধ্য এশিয়ার রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইরানের সমরকন্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত।) শৈশবকালে তাঁর পিতা ইহকাল ত্যাগ করেন। মায়ের কাছে তিনি শৈশব লালিত পালিত হন। শৈশবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইমাম বুখারীর চোখ বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসার ফলেও দৃষ্টিশক্তি ফিরে না আসায় তাঁর মা হৃদয়ের আকুতি নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে দিবানিশি কান্নাকাটি ও দু'আ করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর পুত্রের চোখ ভাল হয়ে গিয়েছে। সকালে উঠে তিনি দেখতে পেলেন পুত্রের চোখের দৃন্টিশক্তি ফিরে এসেছে। বিস্ময় ও আনন্দে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু' রাকআত শোকরানা সালাত আদায় করেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে বুখারার একটি প্রাথমিক মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সে সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটন। এগার বছর বয়সে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এজন্য তিনি তৎকালীন বুখারার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম (রহঃ) এর হাদীস শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন। ষোল বছর বয়সে ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারা ও এর নিকস্থ্ শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস মুখস্থ্ করেন।

হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশ গমন ঃ সর্বপ্রথম হাজ্বের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রঃ)-এর হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশযাত্রা শুরু হয়। ১৬ বছর বয়সে তাঁর মা ও বড় ভাই আহ্মদ সহ হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। মা এবং ভাই দেশে ফিরে আসলেও তিনি তথায় থেকে যান। তিনি মক্কা ও মদীনায় কয়েক বছর অবস্থান করে তথাকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এ সময় তিনি 'কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন'

নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর মদীনায় অবস্থান কালে তিনি চাঁদের আলোতে তারিখে কাবীর রচনা করেন। ইমাম বুখারী হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্র কূফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরে বহুবার সফর করেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মুখস্থ শক্তি ঃ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন ইমাম বুখারী (রঃ) । এক লাখ সহীহ ও দু'লাখ গায়রে হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'তিনি একবার মাত্র কিতাব পড়তেন এবং একবার দেখেই সমস্ত কিতাব মুখস্থ করে ফেলতেন।' ইমাম বুখারী (রঃ) এগার বছর বয়সে বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস দাখেলীর হাদীস বর্ণনাকালে যে ভুল সংশোধন করেছেন, হাদীস বিশারদগণের কাছে তা সত্যিই বিস্ময়কর । মাত্র ষোল বছর বয়সে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুল্লাগ ইবনুর মুবারক ও ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহঃ) এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ মুখস্থ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একবার সমরকন্দে ও বাগদাদে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখনকার বিখ্যাত মুহদ্দিসগণ কতকগুলো হাদীসের সনদ ও সতন উলট পালট করে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সামনে পাঠ করেন এবং এর সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি তা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করেন। এতে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় ঘটে। সাথে সাথে তাঁরা বুখারী (রহঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এক হাজারেরও বেশী সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাক্কী ইবনে ইবরাহীম, আবু আসিম, ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল, আলী মাদানী, ইসহাক সালাম আল-বায়কান্দী ও মুহাম্মদ ইউনুস আল-ফারইয়াবী (রাঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নব্বই হাজারের ও অধিক। তা ছাড়াও তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। এঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম আররাযী (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অবদান জামে সহীহ বুখারী সংকলন। এটা তিনি সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করে ষোল বছরে তা সমাপ্ত করেন। তাছাড়া ও তিনি অনেক গুলো কিতাব প্রণয়ন করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত পিতার বিশাল ধন-ভান্ডার দুস্থ অসহায় ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে

দিয়েছেন। তাঁর সততা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) রমযান মাসে পুরো তারাবীতে এক খতম, প্রতিদিন দিবাভাগে এক খতম এবং প্রতি রাতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তা্ওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী, দান-খায়রাতের বহু ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে জীবনে বহু ঘত-প্রতিঘাত ও কঠিন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৎকালীন বুখারার গভর্নর তার দু' পুত্রকে প্রাসাদে এসে হাদীস পড়ানোর জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা পবিত্র হাদীস শরীফের অবমাননার নামান্তর ভেবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল। প্রাসাদবর্গের চক্রান্তে অত্যন্ত পরিণত বয়সে তাঁকে আপন জন্মভূমি বুখারা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময় সমরকন্দবাসীদের আহবানে তিনি সেখানে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খারতাংগ পল্লীতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল শনিবার ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ ইমাম বুখারী সংকলিত 'সহীহুল বুখারীর পূর্ণ নাম আল-জামিউল মুস্‌নাদুস্ সহীহ আল-মখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুননিহী আয়্যামিহী।

এতে হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়াবলী স্থান লাভ করায় একে জারি বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সন্নিবেশিত হওয়ায় সহীহ্ এবং মারফু মুত্তসিল হাদীস উল্লেখিত হওয়ায় মুসনাদ ইব্‌নে রাহওয়াইর মজলিস হতে লাভ করে ছিলেন। বুখারী শরীফ সংকলনে উদ্যেগী হওয়ার পিছনে ইমাম বুখারী হতে অন্য আর একটি কারণেরও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেহ মুবারকের উপর মাছির আনাগোনাকে পাখা দ্বারা বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। স্বপ্নের তাবীরকারীগণ এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারীকে জানালেন, আপনার দ্বারাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহীহ্ হাদীস একটি গ্রন্থ সংকলনের প্রবল বাসনা জাগ্রত হবে। তাই তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধনার ফলে এ বিশাল সংকলনটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী 'বায়তুল হারাম' অভ্যন্তরে বসে বুখারী শরীফ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। আর মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও রাসূলের রওযা মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে এর বিভিন্ন অধ্যায় ও 'তারজুমাতুল বাব' সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করেন। এ বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি এ সহীহ্ গ্রন্থে এক

একটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করেছি ও দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিয়েছি। তা ব্যতীত আমি একটি হাদীসও লিখিনি।'

ইমাম বুখারী প্রত্যেকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ইস্তেখারার মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ অনন্য সাধারণ সতর্কতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি এ বিশাল সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লাখ হাদীস সামনে রেখে বুখারী শরীফ প্রণয়নের কাজে হাত দেন। এ ছয় লাখের মধ্যে এক লাখ সহীহ্ হাদীস ইমাম বুখারীর মুখস্থ ছিল। এ ছাড়াও প্রায় দু'লাখ গায়রে সহীহ্ হাদীসও তাঁর মুখস্থ ছিল। বুখারী শরীফে একাদিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীস হচেছ ৯০৮২টি। এতে মুয়াল্লিক, মুতাবিয়াত ও মওকুফাত বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩৯৭টি। একধিকবার উল্লেখিত হাদীস ব্যতীত এর সংখ্যা হল ২৬০২টি। অপর এক হিসেব মতে এ পর্যায়ের হাদীসের সংখ্যা হল ২৭৬১টি । (মুকাদ্দামাহ ফাতহুল বারী)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা সম্পর্কে বলেন, এতে ৭২৭৫টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে পুনরুল্লিখিত হাদীসসমূহ গণ্য। তা বাদে হাদীসের সংখ্যা হয় প্রায় চার হাজার। (মুকাদ্দমাহ উমদাতুলকারী)। বুখারী শরীফ হল দীন-ইসলামের এক অক্ষয় স্তম্ভ। প্রত্যেক যুগের আলেম ও মুহদ্দিসগণ এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত বলে অকাতরে ঘোষণা দিয়েছেন। এ পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি সর্বজন বিধিত।

'আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নীচে সর্বাদিক সহীহ্ গ্রন্থ হল সহীহুল বুখারী।' (মুকাদ্দমাহ ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী)।

এ সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বুখারী শরীফ প্রণয়নের পর তারজমাতুল বাব বা শিরোনাম কায়েম করেন। তা কায়েম করতে তিনি গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুগে যুগে সকল আলিম মুহাদ্দিস ও পন্ডিতবর্গ এর মর্ম অনুধাবনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু অদ্যবধি সম্পূর্ণভাবে এর মর্ম উৎঘাটিত হয়নি। আর এ জন্য বলা হয়ে থাকে 'ফিকহুল বুখারী ফী তারাজিমিহী'। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জ্ঞান, বুদ্ধি ও অসাধারণ পান্ডিত্য তাঁর গ্রন্থের তারজমা বা শিরনামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ ঃ ইমাম মুসলিম ২০৪ হিজরী সনে ৮১৭ ঈসায়ী সনে খোরাসানের প্রধান নগর নিশাপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় ২০৩ হিজরীর কথাও পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথম অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কথিত আছে, ২০৪ হিজরী সনের যে দিন ইমাম শাফেয়ী ইন্তেকাল করেন, সে দিনেই ইমাম মুসলিমের জন্ম হয়।

নাম মুসলিম। কুনিয়াত আবুল হুসাইন। উপাধি আসাকেরুদ্দীন। পূর্ণনাম হল আবুল হুসাইন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। ইমাম মুসলিম আরবের প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গোত্র বনু কুশায়রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-কুরাশয়ীরী এবং খোরাসানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় আন-নিশাপুরী বলা হয়। তিনি ইমাম মুসলিম নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শৈশবকালে তাঁর পিতা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী হাজ্জাজ আল-কুশায়রীর কাছে হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সকল শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাত ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্নে ইয়াহ্ইয়া আত-তামিমী, সাঈদ ইব্নে মানসুর প্রমুখ। সারা জীবন তিনি হাদীস সংগ্রহে ও সংকলনের কার্যে অতিবাহিত করেন। উল্লেখ্য, ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর সমসাময়িক ছিলেন। বুখারীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁর বিশাল হাদীসের জ্ঞান-ভান্ডার হতে তিনিও যথেষ্ট মাত্রায় সঞ্চয় করেন।

ইমাম মুসলিম যে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন যে কথা বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এ পর্যায়ে আবু হাতিম আর-রাযী, মুসা ইব্নে হারুন, আহমদ ইব্নে সালামা, মুহাম্মদ ইব্নে মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব ও অতি উচ্চ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন। ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত আশ্চার্যজনক। একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এর সমাধান দিতে পারেননি। পরক্ষণেই ঘরে এসে সংগৃহীত পান্ডুলিপির মধ্যে তিনি হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর পাশেই একটি পাত্র ভর্তি খেজুর ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি অনুসন্ধান করেছিলেন। এতে তিনি এত গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন যে, যখন হাদীসটি

পেলেন তখন পাত্রের খেজুরও শেষ হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থ অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশুদ্ধ ছ'খানা হাদীস সংকলনের মধ্যে সহীহ্ মুসলিম শরীফ অন্যতম। এটা ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। দীর্ঘ পনেরো বছরের অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই বাছাইর পর সহীহ হাদীস সমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন হল মুসলিম শরীফ। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এতে তাকবার বা একাধিকাবার উদ্ধৃত হাদীস সহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকবার বাদে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। (তাদরীবুর রাবী)

মুসলিম শরীফ সংকলনের সময় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। কেবলমাত্র নিজের খেয়াল খুশি ও বুদ্ধির বিবেচনায় যে কোন হাদীসকে তিনি সন্নিবেশিত করেননি। প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মধ্যে পরামর্শ সাপেক্ষে ঐক্যমতে তিনি এ অমূল্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রণয়নের কাজ পরিসমাপ্তির পর তিনি তা তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফেয হাদীস ইমাম আবু যুরয়ার সামনে উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি হাদীসের উপর তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাই ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেন। মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস সমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেনঃ "মুহাদ্দিসগণ দু'শত বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এ বিশুদ্ধ গ্রন্থের ওপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।" (মুকাদ্দামাহ মুস্লিম; নববী)

হাফেয মুসলিম ইব্নে কুরতবী সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে বলেন, 'ইসলামের এরূপ আর একখানি গ্রন্থ কেহই প্রনয়ন করতে পারেননি।' (মুকাদ্দামাহ ফাতহুল বারী।)

কোন কোন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের উর্ধে মুসলিম শরীফ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মুসলিমের বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে এ সংকলিত হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তার সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। বর্তমানে আমরা যে সংকলনটি দেখতে পাচ্ছি তা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবু ইসহাজ ইব্রাহীম ইব্নে মুহাম্মদ ইবনে সুফইয়ান নিশাপুরীর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসছে। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

সুনানে নাসায়ী ঃ সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ 'সুনানে নাসায়ী' এর সংকলকের নাম আহমদ। কুনিয়াত আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম

শুয়াইব। নসবনামা হলঃ আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইব্নে বাহর ইব্নে মান্নান ইব্নে দীনার আন্নাসায়ী। খোরাসানের অন্তর্গত নাসা নামক স্থানে হিজরী ২১৪ মতান্তরে ২১৫ সনের তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পনেরো বছর বয়সে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাদীসের সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ সফর করেন। প্রথমে তিনি কুতাইবা ইব্নে সায়ীদুল বালখীর কাছে গমন করেন এবং সেখানে এক বছর দু' মাস অবস্থান করে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি মিসরে যান এবং সেখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। মিসরে অবস্থান কালে তিনি বেশ কয়েকখনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সময় হতে মানুষেরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করত। ইমাম হাকেম আবু আলী নিশাপুরী হতে বর্ণনা করেন যে, প্রসিদ্ধ চারজন হাফেযে হাদীসের মধ্যে ইমাম নাসায়ী ছিলেন অন্যতম একজন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও মুত্তাকী ছিলেন। ইমাম নাসায়ী হাদীস ও ইলমে হাদীস সম্পর্কিত বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'সুনানে কুবরা' ও 'সুনানে সুগরা' যাকে 'আল মুজতাবা বলা হয় প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ৩০২ হিজরীতে তিনি মিসর ত্যাগ করে দামেশক যান। এখানে অবস্থানকালে তিনি হযরত আলী ও খান্দানে রাসূলের প্রশংসামূলক গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। এখানে তিনি উমাইয়াদের দ্বারা খান্দানে রাসূলের অবমাননার মানসিকতা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি খান্দানে রাসূলের প্রশংসায় লিখিত পুস্তকখানি দামেশকের জামে মসজিদে সমবেত লোকদেরকে পাঠ করে শুনান। এতে উমাইয়া শাসকদের প্রশংসা না থাকায় উপস্থিত লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপর চড়াও হয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে। অমানুষিক নির্যাতনের ফলে মারাত্মক আহত ও কাতর হয়ে পড়েন। অবসন্ন অবস্থায় তাঁর অন্তিম বাসনা ও নিবেদন ছিল, তোমরা আমাকে মক্কা শরীফে পৌঁছে দাও, আমি যেন সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। তাঁকে মক্কায় পৌঁছানো হয়েছিল। সেখানে তিনি ৩০৩ হিজরীতে ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সাফাও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায)।

ইমাম নাসায়ী প্রথমে 'সুনানুল কুবরা' নামে একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সংকলনে সহীহ্ ও গায়রে সহীহ উভয় প্রকারের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরে তিনি শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি সংকলন তৈরী করেন। এর নাম 'আস্সুনানুস্ সুগরা'। এর অপর এক নাম হল, "আল মুজতবা" সঞ্চয়িতা। সুনানে নাসায়ী দ্বারা 'আল মুজতবা'ই উদ্দেশ্য। ইমাম নাসায়ী 'আল মুজতবা' প্রণয়নের সময় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের গ্রন্থ প্রণয়ন রীতির

অনুসরণ করেছেন। এ গ্রন্থখানির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী নিজেই বলেছেন ঃ 'হাদীসের সঞ্চয়ন মুবতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।'

আবু আলী বলেন, ইমাম মুসলিমের চেয়েও ইমাম নাসায়ী হাদীস গ্রহণে রিজাল সম্পর্কে কঠিন শর্তারোপ করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা ইব্‌নে কাসির বর্ণনা মতে সুনানে নাসায়ীতে 'মাজহুল' ও 'মাজরূহ' রাবী রয়েছে এবং এতে 'যয়ীফ' 'মুয়ালয়াল' ও মুনকার হাদীস রয়েছে। ইমাম নাসায়ীর সুনান সংকলনে ৪,৪৮২ টি হাদীস স্থান পেয়েছে। সমস্ত হাদীসগুলোকে ১৫টি শিরনামায় এবং ১৭৪৪ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ীর কাছ থেকে এ গ্রন্থ বহু সংখ্যক ছাত্র শ্রবণ করে থাকলেও বড় বড় দশজন মুহাদ্দিস এ গ্রন্থের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদঃ ইমাম আবু দাউদের পূর্ণ নাম হল, সুলায়মান ইবনুল আশয়াস ইব্‌নে ইসহাক আল আসাদী আস-সিজিস্তানী। আবু দাউদ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি বান্দাহার ও চিশ্‌তি এর নিকটস্থ সীস্তান নামক স্থানে ২০২ হিজরী মুতাবিক ৮১৭ ঈসায়ী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন, পৃঃ ৩৫৮)।

ইমাম আবু দাউদ নিজ জন্ম স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন। অতঃপর হাদীস শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক ও খুরাসান প্রভৃতি প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্র সমূহ পরিভ্রণ করেন। যেখানে তিনি যে হাদীসের সন্ধান পেয়েছেন সেখান থেকেই তিনি তা সংগ্রহ করেছেন। তদানীন্তন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন মুহাদ্দিস হলেন- ইমাম আহম্মদ ইব্‌নে হাম্বল, উসমান ইব্‌নে আবু সাইবা, কুতাইবা ইব্‌নে সায়ীদ প্রমুখ। হাদীসে তাঁর যে অসাধারণ জ্ঞান ও গভীর পারদর্শীতা ছিল, তা এ যুগের সকল বিজ্ঞ জনেরা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির প্রশংসা করেছেন। তাঁর গভীর তাকওয়া ও পরহেযগারীর কথাও সর্বজন স্বীকৃত। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিজরীর ১৬ শাওয়াল বসরা নগরে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আবু দাউদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল 'সুনান' যা হাদীসের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের পরেই "সুনানে আবু দাউদ" এর স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসের এর স্থান তৃতীয়। তিনি এ গ্রন্থখানির সংকলন কার্য যৌবন বয়সেই সমাপ্ত করেছেন। তাঁকে দীর্ঘ বিশ বছর সংকলনের কাজে ব্যয় করতে হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ

হাদীস হতে ছাঁটাই বাছাই ও চয়ন করত ৪৮০০টি হাদীস তাঁর সংকলনে স্থান দিয়েছেন। এ হাদীস সমূহ সবই আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং এর অধিকাংশ 'মহহুর' পর্যায়ের হাদীস। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন, পৃঃ ৪১১)।

ইমাম আবু দাউদ ফিক্‌হর দৃষ্টিভংগিতে হাদীস সমূহ চয়ন করেছেন। ফিক্‌হর সমস্ত বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। আর একারণেই ফিকহ্‌বিদগণ মনে করে-'একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহ্‌র মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের পরে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থই যথেষ্ট।' (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন, পৃঃ ৪১১)।

ইমাম হাফেয আবু ইব্‌নে যুবাইর গরনাতী (মৃঃ ৭০৮ হিঃ) সুনানে আবু দাউদ সম্পর্কে বলেন, "ফিকহ্ সম্পর্কিত হাদীস সমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানে আবু দাউদের যে বিশেষত্ব, তা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই। (তদারীবুর রাবী, পৃঃ ৫৬)।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, 'হাদীসের মধ্যে এ গ্রন্থই মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট।' (ফাতহুল মুগীস, পৃঃ ২৮)

ইমাম আবু দাউদ গ্রন্থখানির সংকলন সমাপ্ত করে একে তাঁর উস্তাদ ইমাম আহম্মদ ইব্‌নে হাম্বলের সমীপে পেশ করেন। তিনি একে উত্তম হাদীসগ্রন্থ বলে প্রশংসা করেন। (গুরুতুল আয়েম্মা, পৃঃ ১৭ ও তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ)। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীস সমূহ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ নিজেই দাবী করে বলেছেন, -'জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মত ভাবে পরিত্যাক্ত কোন হাদীস আমি এতে উদ্ধৃত করিনি।' (মুকাদ্দামা মুয়ালেমুস্ সুনান, পৃঃ ১৭)।

জামে তিরমিযী ঃ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র চতুর্থ গ্রন্থ 'জামে তিরমিযী'র সংকলকের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবু ঈসা। লকব ইমামুল হাফেয। তাঁর পূর্ণনাম ও নসবনামা হল আল ইমামুল হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নে ঈসা ইব্‌নে সওরাতা ইব্‌নে মুসা ইব্‌নে জাহাকুস সুলামী আত্‌তিরমিযী আল বুখারী। তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানার তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিরমিয শহরটি জীহুল নদীর বেলাভূমে অবস্থিত। এ শহরে যুগ শ্রেষ্ঠ অগণিত মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত উলামাদের জন্মগ্রহণের কারণে এটা 'মাদীনাতুর রিজাল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম তিরমিযী প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে সমাপন করেন। অতঃপর তিনি মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্র সমূহ পরিভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। কুফা, বসরা, রাই, খুরাসান, ইরাক ও হিজাযে হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বছরের পর বছর সফর করতে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সময়কার বড় বড় হাদীসবিদদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন। তিনি সর্বমোট এক হাজার হাদীসের উস্তাদ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে কুতাইবা ইব্‌নে সায়ীদ, ইসহাক ইব্‌নে মুসা, মাহমুদ ইব্‌নে গীলান, সায়ীদ ইবনে আবদুর রহমান, মুহামম্‌বিনে বিশর, আলীর ইব্‌নে হাজার, আহমদ ইব্‌নে মুনী, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না সুফিয়ান ইব্‌নে অকী এবং মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসমাঈলুল বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন পৃঃ ৩৬০)।

ইমাম তিরমিযী তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। কোন হাদীস একবার শুনলে দ্বিতীয়বার শুনার আর প্রয়োজন হত না। সাথে সাথে তা তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। ইমাম তিরমিযী জনৈক এক মুহাদ্দিসের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে কোনে দিন সাক্ষাত ঘটেনি। এজন্য সে মুহাদ্দিসের সাক্ষাত লাভের উদগ্রীব বাসনা তাঁর হৃদয় জাগ্রত ছিল। একদিন পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁর সাক্ষাত পান এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত হাদীস শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষ অনুরোধক্রমে পথের মধ্যে দাঁড়িয়েই সমস্ত হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। তা শ্রবণমাত্রই সকল হাদীস ইমাম তিরমিযীর মুখস্থ হয়ে যায়। তা দেখে সে মুহাদ্দীস বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাঁর মেধা পরীক্ষর জন্য তিনি আরো চল্লিশটি হাদীস পাঠ করেন তাও সাথে সাথে ইমাম তিরমিযীর মুখস্থ হয়ে যায় এবং পুনরায় উস্তাদকে শুনিয়ে দেন। অথচ ইতিপূর্বে এ হাদীসগুলো তিনি আর কখনও শ্রবণ করনি। এটাই ছিল তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয়। এছাড়াও তাঁর স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। অসাধারণ মেধার কারণে ইমাম বুখারী তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলতেন। ইমাম তিরমিযী বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আল জামেউত্ তিরমিযী, কিতাবুল আসমা, আল কুনী, শামায়েতুলত তিরমিযী, তাওয়ারীখ ও কিতাবুল যুহদ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। শেষ জীবনে ইমাম তিরমিযী দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। তিনি ২৮৯ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিরমিয শহরে ইন্তেকাল করেন। (আল বেদায়া অন্ নেহায়া, মিযানুল এতেদাল)।

ইমাম তিরমিযীর হাদীসগ্রন্থ 'জামে তিরমিযী' নামে খ্যাত। একে 'সুনান'ও বলা হয়। অবশ্য প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীসবিদগণ গ্রহণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস হতে বাছাই করে ১৬০০ হাদীস তার সুনানের মধ্যে সংকলন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, উপনাম ও খেতাব নির্ধারণ করেননি এবং প্রত্যেক হাদীসের

বিচিত্র নাম সমূহ উদ্ভাবন করে নির্ভরযোগ্য মাত্রা স্থির করার চেষ্টা করেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থখানি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বুখারী অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি অনুযায়ী সংকলন করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। আর এ কারণে তাকে 'জামে' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাফেয আবু তাহের ইব্‌নে যুবাই (মৃঃ ৭০৮হিঃ) এ সম্পর্কে বলেন–"ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস একত্র করে গ্রন্থখানি প্রনয়ন করার যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।" ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থখানি সম্পর্কে অত্যন্ত হৃদয়ের সাথে দাবী করে বলেন–"যার ঘরে এ কিতাবখানি থাকবে, মনে করা যাবে যে তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী করীম(সাঃ) অবস্থান করছেন ও নিজে কথা বলছেন।" বস্তুতঃ সহীহ হাদীস গ্রন্থ সমূহের এটাই সঠিক মর্যাদা। তিরমিযী শরীফের সহজবোধ্যতা সর্বজন বিধিত। একারণে শায়খুল ইসলাম হাফেয ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ আনসারী (মৃঃ ৪৮১ হিঃ) তিরমিযী শরীফকে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহারোপযোগী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা তিরমিযী শরীফ হতে সাধারণ পাঠকও ফায়দা অর্জন করতে পারে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে কেবলমাত্র বিশেষ পারদর্শী আলেম ভিন্ন অপর কেহ ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হয় না। ইমাম তিরমিযীর বহু সংখ্যক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে এ গ্রন্থখানি শ্রবণ করেছেন। কিন্তু এর বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে মাত্র ছ'জন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হতে চলে আসছে। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (রঃ) সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্ সংকলকের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ্। তাঁর পূর্ণ নাম ও নসবনামা হলঃ আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইয়াযিদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাজাহ আল কাজভীনী।

তিনি ২০৯ হিজরী ৮২৮ ঈসায়ী কাজভীন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। (মু'জামুল বুলদান; পৃঃ ৮২)

ইমাম ইব্‌নে মাজাহর জন্মস্থান কাজভীন শহরটি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর হতেই ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। হিজরী তৃতীয় শতকের প্রারম্ভ হতে সেখানে হাদীস চর্চার বিশেষ কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়; ফলে এখানেই অতি শৈশব হতে ইবনে মাজাহ ইলমে হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় কাজভীন শহর যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন মুহাদ্দিস হাদীসের দরস দিতেন। ইব্‌নে মাজাহ তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহন করেন। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ অগনিত মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে আলী ইব্‌নে মুহাম্মদ আবুল

হাসান তানফেসী (মৃঃ ২৩৩), আমর ইব্‌নে রাফে আবু হাজার বিযলী (মৃঃ ২৩৮ হিঃ), ইসমাঈল ইব্‌নে মূসা ইব্‌নে হায়ান তামীমী (মৃঃ ২৮৮ হিঃ এবং মুহাম্মদ ইবনে আবু খালেক আবু বকর কাজভীনী প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম ইব্‌নে মাজাহ হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য ইলমে হাদীসের বিভিন্ন কেন্দ্রভূমিতে ভ্রমণ করেন। তিনি মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়াসত, দামেশ্‌ক, হিমস, মিসর, তিন্নীস, ইসফাহা, নিনাপুর প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্র সমূহের সফল করে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'সুনানে ইব্‌নে মাজাহ' হাদীসশাস্ত্র তাঁর এক অমর সংকলন। তিনি হাদীসের ভিত্তিতের কুরআনের একখানি বিরাট তফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তারিখে মলীহ নামে তিনি একখানা ইতিহাস রচনা করেন। এতে সাহাবাদের যুগ হতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তিনি ২৭৩ হিজরী ৮৮৬ ঈসায়ী সোমবার ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ অপরিসীম শ্রম-সাধনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ গ্রন্থখানির প্রণয়নকার্য সম্পন্ন করেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস হতে ছাটাই বাছাবই করে মাত্র চার হাজার হাদীসকে তিনি তাঁর সুনানে সংকলিত করেছেন। এ গ্রন্থে মোট ৩২টি পরিচ্ছেদ, পনের শত অধ্যায় রয়েছে। (আল বিদায়রা আন নিহায়াহ)। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ তা প্রণয়ন করে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু যুরয়ার কাছে পেশ করেন। তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ গ্রন্থখানি দু'টি দিকের বিবেচনায় সিহাহ সিত্তাহ্‌র মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

প্রথমতঃ এর রচনা, সংযোজন, সজ্জায়ন ও সৌকর্য। এতে হাদীস সমূহ এক বিশেষ সজ্জায়ন পদ্ধতিতে ও অধ্যায় ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে। কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। সিহাহ সিত্তার অপর গ্রন্থে এ সৌন্দর্য অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এতে এমন সব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, যা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। এ কারণে এর ব্যবহারিক মূল্যায়ন অন্যান্য গ্রন্থাবলীর তুলনায় অনেক বেশী। সিহাহ্‌ সিত্তাহর অপর পাঁচখানি গ্রন্থের তুলনায় ইব্‌নে মাজায় যয়ীফ হাদীসের সংখ্যা তুলনামুলক বেশী হওয়ার কারণে এর স্থান ষষ্ঠতম।

সমাপ্ত